আলো

রায়-সাহেব

৺জগদানন্দ রায়-প্রণীত

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস

২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা

ও

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড—এলাহাবাদ

১৩৪৪

[মূল্য দুই টাকা

প্রকাশক

শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড

এলাহাবাদ

প্রিণ্টার

শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড

এলাহাবাদ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম কথা	১
আলোক-জ্ঞান	৪
আলোর বাহন	৫
আলোর উৎপত্তি	৯
আলো-উৎপাদনের প্রণালী	১২
স্বচ্ছ, অনচ্ছ ও অর্দ্ধস্বচ্ছ বস্তু	১৬
আলোর চলাচল ও ছায়া	২০
পূর্ণচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া	২৭
আলোর তেজ	৩৫
আলোর বেগ	৪৪
আলোর প্রতিফলন	৫০
চড়ানো আলো	৫৬
প্রতিফলিত আলোর দিক্	৬২
প্রতিবিম্ব	৬৪
ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়না	৬৯
ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়নার প্রতিবিম্ব	৭৭
কুব্জপৃষ্ঠ আয়নার প্রতিবিম্ব	৮১
বিবর্ত্তন	৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা

চরম-বিবর্ত্তন ও পূর্ণ-প্রতিফলন ...	৯২
মরীচিকা ...	৯৬
পরকলা ...	১০২
কুব্জপৃষ্ঠ পরকলা ...	১০৫
কুব্জপৃষ্ঠ পরকলার প্রতিবিম্ব ...	১০৯
ন্যুব্জপৃষ্ঠ পরকলা ...	১১৪
তে-শিরা পরকলা ...	১১৬
রঙ্ ...	১২৫
মেঘের ও আকাশের রঙ্ ...	১৩৬
পরিপূরক রঙ ...	১৪৩
রঞ্জক বস্তু ...	১৪৬
বর্ণচ্ছত্র ...	১৪[illegible]
সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রে কৃষ্ণ-রেখা ...	১৫২
আলোক-বিশ্লেষণ ...	১৫৪
রশ্মি-নির্ব্বাচন যন্ত্র ...	১৬৩
রামধনু ...	১৬৬
অদৃশ্য আলো ...	১৬৯
আলোয় আলোয় অন্ধকার ...	১৭৫
অণুবীক্ষণ যন্ত্র ...	১৮১
দূরবীক্ষণ যন্ত্র ...	১৮৪
ফোটোগ্রাফের ক্যামেরা ...	১৮৮
আমাদের চোখ্ ...	১৯১

বিষয়				পৃষ্ঠা
চোখের পর্দ্দা ও বর্ণজ্ঞান	...	...	...	২০৪
আকৃতি ও দূরত্ব বোধ	...	...	...	২১১
চোখের দোষ	...	...	...	২১৭
বায়োস্কোপ	...	...	...	২২৬

নিবেদন

দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমের ফলে আলো প্রকাশিত হইল। ইহা সাধারণ পাঠক ও আমাদের বালক-বালিকাগণের চিত্তাকর্ষণ করিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন, বীরভূম
শ্রাবণ—১৩৩৩

৺জগদানন্দ রায়

আলো

—:*:—

প্রথম কথা

রাত্রির অন্ধকারে পৃথিবী ঢাকা—সব স্তব্ধ। পাখীর ডাক নাই; ছেলেদের কলরব নাই; পথে পথিক নাই; কাহারো পায়ের শব্দ শুনা যায় না। পৃথিবীর সকলেই ক্লান্ত ও ঘুমে অচেতন। এমন-কি আকাশের খণ্ড চাঁদ-খানিকে দেখিলে মনে হয় বুঝি ঘুমে তাহারো চোখ বুজিয়া আসিতেছে; কোনো গতিকে পশ্চিমে অস্ত গেলেই যেন সে বাঁচে। এই সময়ে তোমাদের বাগানের গাছপালার দিকে লক্ষ্য করিয়ো,—বোধ হইবে যেন তাহারাও অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছে। তখন তাহাদের পাতায় চোখ জুড়ানো শ্যামলতা থাকে না এবং ফুলে-ফলেও সেই আশ্চর্য্য রঙের বাহার দেখা যায় না। তা'র পরে রাত্রিশেষে যেই পূবের আকাশে আবির খেলার ধুম লাগিয়া যায়, অমনি প্রকৃতি জাগিয়া উঠে। কেবল জাগরণ নয়, তখন আকাশ-বাতাস জল-স্থল আনন্দে ভরিয়া যায়; পশুপক্ষীর আনন্দ-কোলাহলে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে। গাছপালারা তাহাদের শত-শত

পাতা আলোতে ধরিয়া সহস্র-মুখে আলোর ধারা পান করিতে থাকে।

অন্ধকার মৃত্যু, আলো প্রাণ। অন্ধকার দুঃখ, আলোই আনন্দ। মেঘে-মেঘে, লতায়-পাতায়, ফুলে-ফলে. পাখীর পালকে প্রজাপতির ডানায় তোমরা যে সব রঙ দেখিতে পাও, আলোই তাহা উৎপন্ন করে। কোটী কোটী ক্রোশ দূরের নক্ষত্র-লোকে যে অগ্নিকাণ্ড চলিতেছে, তাহার খবর নক্ষত্রদের ক্ষীণ আলোর রেখাই আমাদের কাছে পৌঁছাইয়া দেয়। ব্রহ্মাণ্ডে যদি আলো না থাকিত, তাহা হইলে এই সৃষ্টির মূর্ত্তি যে কি হইত, তাহা ভাবিলেও হৃদ্‌কম্প হয়। যে জন্মান্ধ তাহার কাছে এই পৃথিবী যেমন নিরানন্দ ও আলোকহীন, ব্রহ্মাণ্ড বোধ করি তাহা অপেক্ষাও নিরানন্দ হইত। তাই আলোই সকল আনন্দের মূল।

আলোর কাজগুলি দেখিলে কবির সেই গানটা মনে পড়িয়া যায়,—

"আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা!
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার
আলো হৃদয়ভরা!

* * *

আলোর স্রোতে পাল তোলে রে
হাজার প্রজাপতি—
আলোর ঢেউয়ে উঠ্‌ল নেচে
মল্লিকা মালতী।

মেঘে মেঘে সোনা—ও ভাই
যায় না মাণিক গোণা,
পাতায় পাতায় হাসি—ও ভাই
পুলক রাশি রাশি
সুরনদীর কূল ডুবেছে
সুধা-নিঝর ঝরা।
আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।”

যাহা হউক, কি-রকমে আলো উৎপন্ন হয়, কি-রকমে আমরা আলো দেখি, আলোর গুণ কি এবং কি-রকমেই বা তাহা নানা রঙের খেলা দেখায় এই সকল তোমাদের জানিতে ইচ্ছা হয় না কি? আমরা এই পুস্তকে একে একে তোমাদিগকে সেই সকল কথা বলিব।

আলোক-জ্ঞান

ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষাকালের রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া এই শব্দ শুনিতে বেশ লাগে ; কখন ঘুম আসে জানাই যায় না। যখন বৃষ্টির শব্দ শুনা যাইতেছে, তখন দুই কান আঙুল দিয়া জোরে বন্ধ করিয়ো। এই অবস্থায় শব্দ শুনা যাইবে কি ? কখনই যাইবে না। বাতাসে যে শব্দের ঢেউ চলিয়া বেড়ায়, তাহা কানের ভিতরে না গেলে আমরা শব্দ শুনিতে পাই না। তাহা হইলে দেখ, যতক্ষণ শব্দের ঢেউ কানে আসিয়া না পড়ে, ততক্ষণ তাহা শব্দই নয়,—তখন তাহা বাতাসের একটা আন্দোলন মাত্র। যাহাকে আমরা আলো বলি, সে-সম্বন্ধেও ঠিক্ এই রকম কথাই বলা যায়। চোখে আসিয়া না পড়িলে আমরা আলোকে আলো বলিয়াই বুঝিতে পারি না।

প্রাতে সূর্য্য উঠিয়াছে। চারিদিক সোনার আলোকে ভরিয়া গিয়াছে। তুমি যেন জোরে চোখ বন্ধ করিলে। এমন সুন্দর আলো পলকে কোথায় চলিয়া গেল। তখন তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল কেবল অমাবস্যার রাত্রির মতো ঘোর অন্ধকার।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, চোখই আমাদের আলোর জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। যাহার চোখ নাই, যে অন্ধ তাহার কাছে আলো-আঁধার দুইই সমান।

আলোর বাহন

আলো জিনিষটা কি, তাহা বোধ হয় তোমরা জানিতে চাহিতেছ। কিন্তু সে-সম্বন্ধে সব কথা তোমাদিগকে এখন বলা চলিবে না। কেবল জানিয়া রাখো, পুষ্করিণীর স্থির জলের কোনো অংশে ঢিল ফেলিলে যেমন সেখান হইতে ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠিয়া কাতারে-কাতারে ছুটিতে থাকে, আলো কতকটা যেন সেই রকমেরই ঢেউ। ইহা উজ্জ্বল জিনিষ হইতে বাহির হইয়া ঠিক্ সোজা পথে এক রকম ঢেউয়ের আকারেই চারিদিকে ছুটিয়া চলে।

জলের ঢেউ জলের উপর দিয়া চলে ; শব্দের ঢেউ বাতাসকে কাঁপাইতে কাঁপাইতে ছুটিয়া যায়। জলের ঢেউ আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু বাতাসের ঢেউ দেখা যায় না। ঝড়ের সময়ে যখন কাঁচা আমগুলি গাছ হইতে পড়ে, বড় বড় গাছ উল্‌টাইয়া যায়, তখন বুঝিতে পারি বাতাসই ঝড়ের শক্তি বহিয়া এই কাজগুলি করে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, নদীর ঢেউয়ের বাহন জল, এবং শব্দের ও ঝড়ের বাহন বাতাস। এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, আলোর বাহন কি ? কে আলোর ঢেউকে বহিয়া আনিয়া চোখে ফেলে ? বাতাসকে আলোর বাহন বলা যায় না। তোমাদের ঘরে যে বিদ্যুতের বাতি জ্বলে, তাহার কাচের আবরণের ভিতরে বাতাস নাই। তবুও আলোর ঢেউ সেই বায়ুশূন্য জায়গা হইতে বাহির হইয়া, আমাদের চোখে আসিয়া ঠেকে। সুতরাং

বাতাসকে আলোর বাহন বলা যায় না। পৃথিবী সূর্য্য হইতে কত দূরে আছে, তোমরা বোধ করি সকলে তাহা জানো না। এই দূরত্ব প্রায় নয় কোটী ত্রিশ লক্ষ মাইল। পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝের রাস্তায় বাতাস নাই—জলও নাই। বাতাস আছে কেবল পৃথিবীকে ঘেরিয়া পঞ্চাশ-ষাট্ মাইল উপর পর্য্যন্ত। তবে সূর্য্যের আলোর ঢেউ কাহাকে অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসে? কেবল সূর্য্য নয়, তোমরা আকাশে যে-সব নক্ষত্রকে মিটি-মিটি জ্বলিতে দেখ সেগুলির অনেকেই সূর্য্যের চেয়ে বড় জিনিষ এবং সূর্য্যের চেয়ে অনেক দূরে থাকিয়া আলো দেয়। তাহাদেরো আলোর ঢেউ মহাশূন্যের ভিতর দিয়া আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে। কে এই আলোর ঢেউ বহিয়া আনে?

ইহার জবাবে আগেকার বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেন, জ্বলন্ত জিনিষ হইতে এক রকম খুব ছোটো ছোটো কণিকা ভয়ানক বেগে বাহির হইয়া চারিদিকে ছুটিয়া চলে। সেইগুলিই যখন চোখে আসিয়া ধাক্কা দেয়, তখনি আমরা আলো দেখি। তাঁহারা আরো বলিতেন, সেই কণিকাগুলি এত ছোটো ও এত লঘু যে, কাচের ভিতর দিয়া এবং জলের ভিতর দিয়া অনায়াসে যাওয়া-আসা করিতে পারে এবং নিক্তিতে ওজন করিলে তাহাদের ভার বুঝা যায় না। তা'ছাড়া সেগুলি রবারের বলের মতো স্থিতিস্থাপক। টেনিস্ বল্‌কে জোরে দেওয়ালের গায়ে ছুড়িলে, তাহা যেমন ঠিক্‌রাইয়া আসে, সেই রকম আলোর কণিকা কোনো জিনিষে পড়িলে ঠিক্‌রাইয়া ভিন্ন পথে চলে। তাই সূর্য্যের আলোর

যে-সব কণিকা চাঁদের উপর পড়ে, সেগুলি সেখানে ঠিক্‌রাইয়া পৃথিবীতে আসিলে জোৎস্না আলো দেখা যায়। আয়নার উপরে যেগুলি পড়ে, তাহা ঠিক্‌রাইয়া দেওয়ালের গায়ে বা দূরের কোনো জায়গায় আসিলে সেখানে রৌদ্রের আলো দেখা যায়। প্রাচীন পণ্ডিতদের এই আলোক-কণিকায় আগেকার লোকে খুব বিশ্বাস করিত। কিন্তু পরে ইহাতে অনেক গলদ ধরা পড়িয়াছিল। তাই আজকাল কেহই আলোক-কণিকায় বিশ্বাস করেন না।

আলোর উৎপত্তি-সম্বন্ধে আজকালকার বড় বড় পণ্ডিতেরা যাহা বলেন, তাহা বড় আশ্চর্য্য। তাঁহাদের মতে যে মহাশূন্যে চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্র রহিয়াছে এবং যাহার ভিতর দিয়া পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহা শূন্য নয়। "ঈথর" নামে এক রকম স্বচ্ছ পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জায়গাই জুড়িয়া আছে। নানা জিনিষের অণু-পরমাণুর মধ্যে যে একটু ফাঁক আছে, সেখানেও ঐ ঈথর বর্ত্তমান। আমরা রবারকে খুব স্থিতিস্থাপক মনে করি। জোরে টানিলে ইহা লম্বায় বড় হয় এবং ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্বের আকার ফিরিয়া পায়। ঈথর রবারের চেয়েও স্থিতিস্থাপক। কেবল ইহাই নয়, বিজ্ঞানের মতে ঈথর কঠিন জিনিষের মতো নিরেট ও শক্ত। তোমরা বোধ করি কথাগুলিকে অসম্ভব মনে করিতেছ। কিন্তু ইহাতে অসম্ভব কিছুই নাই। যাহা স্বভাবের নিয়মকে না মানিয়া চলে তাহাই অসম্ভব। ঈথরে কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার আজও ধরা পড়ে নাই। ধরা পড়িলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ অসম্ভব ও মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ করিতে হইবে।

তোমরা হয়ত বলিবে, ঈথর যদি কঠিন পদার্থের মতো জিনিষ হয়, তবে অহার ভিতর দিয়া আমাদের চলা-ফেরা এবং গ্রহ-নক্ষত্রদের আনাগোনা কি-রকমে চলে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, জল বা অন্য কোনো তরল পদার্থের ভিতর দিয়া লোহার জাল টানিয়া লইলে জাল জলে বাধা পায় কি? অতি অল্পই পায়,—জালের ফাঁক দিয়া জল চলিয়া যায়। সুতরাং যদি বলা যায়, এই জগতের সমস্ত পদার্থের অণু-পরমাণুর মধ্যে যে ফাঁক আছে; তাহার ভিতর দিয়া ঈথর অবাধে চলা-ফেরা করে, তাহা হইলে কিছু অন্যায় বলা হয় না।

সোনা রূপা তামা-মাটি পাথর প্রভৃতির মতো ঈথরের ভার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, সম্ভবত তাহার ভার নাই। তোমরা ইহা শুনিয়া হয়ত বলিবে, ভারহীন জিনিষ অসম্ভব। কিন্তু ইহা অসম্ভব নয়,—যাহার ভার নাই এ-রকম জিনিষ অনায়াসেই কল্পনা করা যায়। এখানে যে জিনিষটার ওজন এক সের, গভীর সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া তাহাকে পৃথিবীর কেন্দ্রের কাছে লইয়া যাও, দেখিবে তাহারি ওজন হইয়াছে হয়ত দেড় সের। উড়ো জাহাজে করিয়া বা অন্য কোনো উপায়ে তাহাকে পৃথিবী হইতে দূরে লইয়া যাও, দেখিবে তাহার ওজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে হয়ত আধ সের। এই রকমে দূরে—অতি দূরে লইয়া গেলে জিনিষটার ওজন যে একবারে লোপ পাইবে, তাহাতে অসম্ভব কি? সুতরাং যদি সর্ব্বব্যাপী ঈথরকে ভারহীন বলা হয়, তাহা হইলে অদ্ভুত বা অসম্ভব কিছুই বলা হয় না।

আলোর উৎপত্তি

মনে কর, একটা লোহার গোলাকে গরম করা যাইতেছে। যখন ইহা অল্প গরম থাকে, তখন তাহা হইতে আলো পাওয়া যায় না। সে সময়ে উহা কেবল গরমই হয়,—তাই কাছে হাত রাখিলে হাতে তাপ লাগে। তা'র পরে যখন গরমের মাত্রা বাড়ে, তখন তাহা লাল হইয়া উঠে। আরো গরম করিলে কালো লোহার গোলা হইতে সাদা আলো পাওয়া যায়। বাড়ীতে যদি বিদ্যুতের বাতি থাকে, পরীক্ষা করিলে সেখানেও তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ অল্প গেলে বাতির ভিতরকার তার গরম হয় মাত্র। তা'র পরে বিদ্যুতের পরিমাণ ক্রমে বাড়াইতে থাকিলে, সেই তারই প্রথমে লাল এবং পরে সাদা হইয়া সুন্দর আলো দিতে থাকে।

এই তাপ ও আলোর উৎপত্তি-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা কি বলেন, তোমাদিগকে এখন বলিব। ইহারা বলেন, লোহার গোলা বা অপর যে-কোনো জিনিষ যখন গরম হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার অণুগুলি খুব তাড়াতাড়ি কাঁপিতে আরম্ভ করে। জলের মধ্যে হাত ডুবাইয়া হাতখানিকে কাঁপাইতে থাকিলে কি হয় তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো। হাতের কাঁপুনিতে জল কাঁপে এবং তাহাতে জলে ঢেউ উঠে। তাপ পাইয়া বা অন্য কারণে যখন কোনো জিনিষের অণু কাঁপিতে থাকে, তখন সেই কাঁপুনিতে পাশের ঈথর

ধাক্কা পাইয়া একরকম ঢেউয়ের সৃষ্টি করে। নদী বা পুষ্করিণীর জলের ঢেউ তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। পদ্মা নদীতে যখন ঝড় উঠে, তখন ঢেউগুলি হয় একতলা দেড়তলা সমান উঁচু এবং সেই রকম চওড়া। আবার যখন ঝড় থাকে না, কেবল দখিনে বাতাস ঝির্-ঝির্ করিয়া বহিতে থাকে ; তখনকার ঢেউ হয় নিতান্ত ছোটো। কোনো গরম জিনিষের অণু কাঁপিলে ঈথরে ছোটো-বড় সব রকমেরই ঢেউ হয় এবং সেই ঢেউ চলে ঈথরের ভিতর দিয়া সেকেণ্ডে এক লক্ষ সাতাশী হাজার মাইল বেগে। খুব বড় ঢেউগুলি উৎপন্ন করে তাপ এবং ছোটোগুলি চোখে আসিয়া ধাক্কা দিলে আমরা আলো দেখিতে পাই।

ঈথরের যে-সব ঢেউ চোখে পড়িলে আমরা আলো দেখি, তাহা যে কত ছোটো বোধ করি তোমরা জানো না। রামধনুতে যে লাল আলো আমাদের নজরে পড়ে, তাহার ঢেউ লম্বায় এক ইঞ্চির কোটী ভাগের দুই শত একাত্তর ভাগ মাত্র। অর্থাৎ লাল রঙ উৎপাদক ঢেউ লম্বায় $\frac{২৭১}{১০০০০০০০}$ ইঞ্চির সমান। যে-সব আলো আমরা দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে আবার লাল আলোর ঢেউই সব চেয়ে বড়। হলুদ, সবুজ, নীল, বেগুণে প্রভৃতি আলোর ঢেউ আরো ছোটো। আলোর ঢেউ চলে সেকেণ্ডে এক লক্ষ সাতাশী হাজার মাইল বেগে। সুতরাং যে ঢেউয়ে লাল আলো উৎপন্ন হয়, তাহার কতগুলি প্রতি সেকেণ্ডে আমাদের চোখে ধাক্কা দেয় তাহার হিসাব করা চলে। তোমরা আলোর বেগকে ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য দিয়া ভাগ করিলে তাহা জানিতে পারিবে।

এইরকম হিসাবে দেখা যায়, প্রতি সেকেণ্ডে ৪৩৪৪২·০০০০০০০০০০০ গুলি ঢেউ চোখে না পড়িলে আমরা লাল আলো দেখি না। যে ঢেউয়ে আমরা বেগুণে আলো দেখি তাহা প্রতি সেকেণ্ডে ৭৫৮৮৪০০০,০০,০০,০০০ বার চোখে ধাক্কা দেয়। হলুদ, সবুজ, নীল প্রভৃতি আরো যে-সব আলো আছে, তাহাদের ঢেউ এই দুই সীমার মধ্যে থাকে। কি ভয়ানক ব্যাপার! তোমরা হয়ত ইহা অবিশ্বাস করিতেছ। কিন্তু অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই, আলোর ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকেরা খুব সূক্ষ্ম হিসাব-পত্র করিয়া বাহির করিয়াছেন।

আলো উৎপাদনের প্রণালী

কত রকমে আলো উৎপন্ন করা যায় তোমরা সকলে, বোধ হয় তাহা জানো না। এখন তোমাদিগকে সেই কথাই বলিব।

যে-সব জিনিষ হইতে আলো পাওয়া যায়, তাহাদের বিষয় ভাবিলে প্রথমে সূর্য্যের কথাটাই আমাদের মনে পড়িয়া যায়। সূর্য্য হইতে আমরা যে আলো পাই, শত শত বিদ্যুতের বাতিতেও তাহা পাওয়া যায় না। একজন বৈজ্ঞানিক সূর্য্যের আলোর একটা হিসাব করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, সাড়ে পাঁচ হাজার মোম-বাতি জ্বালাইয়া এক ফুট দূরে দাঁড়াইলে যে আলো পাওয়া যায়, তাহাই কোনো গতিকে সূর্য্যের আলোর সমান হয়। যাহা হউক, সূর্য্যের আলো কিরকমে উৎপন্ন হয় তাহা বোধ করি তোমরা জানো না। নানা পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, সূর্য্যকে ঘিরিয়া অনেক রকম বাষ্প দিবারাত্রি জ্বলিতেছে। ইহাতে বাষ্পের এবং নানা জিনিষের অণু কাঁপিয়া ঈথরে যে ঢেউ তোলে, তাহাই পৃথিবীতে আসিয়া যখন চোখে ঠেকে, তখন আমরা আলো দেখি। প্রদীপ জ্বালিলে, গ্যাস পোড়াইলে যে আলো হয় সে-সম্বন্ধেও ঠিক্ এই কথাই বলা চলে। প্রদীপের যে অংশকে আমরা শিখার আকারে দেখিতে পাই, তাহা তেলের বাষ্প ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই গরম বাষ্পের ভিতরকার কোনো কঠিন জিনিষের কণা যখন খুব গরম হইয়া কাঁপিতে থাকে, তখনি শিখা হইতে আলো পাওয়া

যায়। তোমরা স্পিরিট ল্যাম্পের আলো হয়ত অনেকে দেখিয়াছ। মোম-বাতি পোড়াইলে বা তেলের প্রদীপ জ্বালাইলে যে আলো পাওয়া যায়, স্পিরিটের আলো তাহার চেয়ে অনেক কম হয়। ইহাতে বই পড়ার কাজ চলে না। স্পিরিটের শিখায় খাঁটি বাষ্প পোড়ে বলিয়া আলো হয় না। তোমরা স্পিরিট ল্যাম্পের শিখায় যদি একটু ধূলা বা খড়ি-মাটীর গুঁড়া ঝাড়িয়া দিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, হঠাৎ উহার আলো উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। স্পিরিট্ ল্যাম্পের তাপে খড়ি-মাটী ও ধূলার কণা উজ্জ্বল হইয়া পড়ে বলিয়াই আলো পাওয়া যায়।

এই ত গেল তাপে আলোর উৎপত্তির কথা। বিনা তাপে বা অল্প তাপে যে আলো হয়, তাহা বোধ করি তোমরা দেখ নাই। জোনাক্-পোকার লেজে যে আলো রাত্রিতে টিপ্-টিপ্ করিয়া জ্বলে, তাহাতে তাপ থাকে না। একটা জোনাক্-পোকা ধরিয়া পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে তাহার লেজ গরম নয় এবং তাহাতে হাত দিলে হাত পোড়ে না। আজকাল ঘড়ির কাঁটায় যে ইউরিনিয়ম প্রভৃতি ধাতু-ঘটিত জিনিষের প্রলেপ দেওয়া হয়, ইহাতে রাত্রির অন্ধকারে কাঁটাগুলিকে জ্বলিতে দেখা যায়। তাই ঘড়িতে কত সময় হইয়াছে অন্ধকারেও জানা যায়। তোমরা নিশ্চয়ই এই রকম ঘড়ি দেখিয়াছ। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, এই আলোতেও তাপ বুঝা যায় না। কেঁচো প্রভৃতি প্রাণীর গা হইতে এবং অনেক পচা জিনিষ হইতে কখনো কখনো এক রকম আলো বাহির হয়। তোমরা হয়ত ইহা লক্ষ্য কর নাই। কেঁচোর

গা হইতে যে আলো বাহির হয়, ইহা আমরা অনেকবার দেখিয়াছি। তোমরাও পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে। তা' ছাড়া সমুদ্রের জলে কখনো কখনো যে এক রকম খুব ছোটো পোকা ভাসিয়া বেড়ায়, সেগুলির গা হইতেও আলো বাহির হইতে দেখা যায়। অথচ সে আলোতে তাপ থাকে না।

তাহা হইলে দেখ, আলো উৎপন্ন করিতে গেলে যে, সকল সময়েই তাপের দরকার হয়, তাহা নয়। বিনা তাপের আলো স্বভাবের অনেক জিনিষেই দেখা যায়। কেমন করিয়া এই আলো উৎপন্ন হয়, সে-সব কথা তোমাদিগকে এখানে বলিব না। কিন্তু তোমরা জানিয়া রাখিয়ো, নানা দেশের বড় বড় পণ্ডিত বিনা তাপে আলো উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া বিশেষ ফল পান নাই। আমরা যে-রকমে আলো উৎপন্ন করি, তাহাতে শক্তির অনেক বাজে খরচ হয় না কি? কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলা যাউক। মনে কর, সন্ধ্যার সময়ে যেন তুমি পড়ার ঘরের ল্যাম্পটিতে তেল ভরিয়া জ্বালাইলে। ইহাতে ঘরটি আলোতে ভরিয়া গেল। কিন্তু আলো উৎপন্ন হইল কি-রকমে? তেল পুড়িয়া গরম বাষ্প হইল; সেই গরম বাষ্পের ভিতরকার কঠিন জিনিষের কণাগুলি কাঁপিল এবং তাহাতে যে আলোর ঢেউ উঠিল, সেগুলি চোখে আসিয়া ধাক্কা দিলে আমরা আলো দেখিলাম। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ল্যাম্পের চিম্‌নি গরম হইল এবং চারিদিকের বাতাসও গরম হইয়া উঠিল। আমরা চাহিয়া ছিলাম আলো, কিন্তু হইয়া দাঁড়াইল আলোর সঙ্গে অনেকটা তাপ। এই তাপটাকে

আমরা বাজে খরচ বলিব না কি? এই বাজে খরচটা যে কত বেশী তাহা শুনিলে তোমরা অবাক্ হইবে। মনে কর, তুমি যেন এক শত টাকা পকেটে লইয়া বই কিনিতে বাজারে গেলে। দোকানদার তোমাকে ঠকাইয়া এক শত টাকার বদলে কেবল দুই টাকার বই দিল। ইহাতে কত টাকা বাজে খরচ হইল বলা যায় না কি? আটানব্বুই টাকা বাজে খরচ হইল। আমরা যখন গ্যাস্ জ্বালাইয়া তেল পোড়াইয়া আলো জ্বালিতে যাই, তখন তাহাতে ঠিক এই রকমেরই বাজে খরচ হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, তেল পুড়িয়া যে-শক্তি উৎপন্ন করে, তাহার একশত ভাগের দুই ভাগ মাত্র আলোর জন্য খরচ হয়। আর বাকী আটানব্বুই ভাগ কেবল তাপ উৎপন্ন করিয়া ঘরের বাতাসকে ও ল্যাম্পকে বৃথা গরম করে। ভাবিয়া দেখ, কি ভয়ানক অপব্যয়। দুই টাকার জিনিষের জন্য যদি এক শত টাকা খরচ করিতে থাকা যায়, তাহাতে রাজার ধনাগারও দু'দিনে খালি হইয়া যায়। কিন্তু মানুষ আলোর জন্য হাজার-হাজার বৎসর ধরিয়া তেল, কয়লা ও কাট পোড়াইয়া এই রকমেই বাজে খরচ করিয়া আসিতেছে। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যে-শক্তি আছে, তাহা অফুরন্ত নয়। হয়ত বহুকাল পরে এমন দিন আসিবে, যখন লোকে আর মাটী খুঁড়িয়া তেল বা কয়লা পাইবে না এবং বন-জঙ্গলে কাঠও মিলিবে না। ভাবিয়া দেখ, তখন মানুষের কি দুর্দ্দশা হইবে। এই দুর্দ্দশা যাহাতে না হয়, তাহারি জন্য আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা তাপহীন আলো উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন।

স্বচ্ছ, অনচ্ছ ও অর্দ্ধস্বচ্ছ বস্তু

সব জিনিষের ভিতর দিয়া কি আলো আসিতে পারে? কখনই না। বৈশাখ মাসের দুপুরে যে ভয়ানক রৌদ্র হয়, তাহার আলো চোখে লাগিলে যেন চোখ্ টন্‌টন্ করে। তাই আমরা দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ঘরে আলো আসিতে দিই না। ঘর অন্ধকার হইয়া যায়। বর্ষাকাল; আকাশ মেঘে ঢাকা; সঙ্গে সঙ্গে পূবে হাওয়া বহিতেছে। ঘরের বারান্দায় বসিয়া লেখাপড়া করার উপায় নাই,—সেখানে বৃষ্টির ছাট্ লাগে। এই রকম দিনে আমরা কি করি? ঘরের দরজা-জানালা খুলিয়া সার্সি বন্ধ করিয়া দিই। বাহিরে যে-অল্প আলো থাকে তাহা সার্সির কাচের ভিতর দিয়া ঘরে আসে, কিন্তু বৃষ্টির ছাট্ ও বাতাস ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহা হইলে দেখ, কাঠের কপাটে যেমন আলো আটকায়, কাচের সার্সিতে তাহা পারে না। যে-সব জিনিষের ভিতর দিয়া সাধারণ আলো অবাধে আনাগোনা করিতে পারে, সেগুলিকে বলা হয় স্বচ্ছ (Transparent) জিনিষ এবং যাহার ভিতর দিয়া আলো যাওয়া-আসা করিতে পারে না তাহাকে বলা হয় অনচ্ছ (Opaque) বস্তু। কাজেই কাচকে স্বচ্ছ এবং কাঠকে অনচ্ছ বলিতে হয়।

কিন্তু আমরা যে-সব জিনিষ সর্ব্বদা দেখিতে পাই, সেগুলির মধ্যে কাচ ছাড়া আরো অনেক স্বচ্ছ জিনিষ আছে। অভ্র, জল

ও বাতাস স্বচ্ছ বস্তু। অভ্রের ভিতর দিয়া অবাধে আলো চলিয়া আসে। আজকাল মোটর গাড়ীর জানালায় কাচের বদলে অভ্র লাগানো থাকে। কোনো কোনো ল্যাম্পে কাচের চিম্‌নির বদলে অভ্রের চিম্‌নি ব্যবহার করা হয়। জল যখন বেশী গভীর না হয়, তখন তাহার ভিতর দিয়া অবাধে আলো যাওয়া-আসা করিতে পারে। আমরা নদীর চরে বেড়াইতে গিয়া দেখিয়াছি, এক হাত গভীর জলের নীচে যে-সব মাছ খেলা করিয়া বেড়ায়, সেগুলিকেও স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু খুব গভীর জলের ভিতর দিয়া আলো যাওয়া-আসা করিতে পারে না। তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, পৃথিবীকে ঘিরিয়া প্রায় পঞ্চাশ-ষাট মাইল গভীর বাতাস আছে। বাতাস স্বচ্ছ বলিয়াই চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রদের আলো তাহার ভিতর দিয়া পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। বাতাস স্বচ্ছ না হইলে সূর্য্যের ও প্রদীপের আলো বাতাসে আট্‌কাইয়া যাইত। তখন আমরা পৃথিবীতে একটু আলোও দেখিতে পাইতাম না। ভাবিয়া দেখ, তখন কি মুস্কিলই হইত। কিন্তু একথা মনে রাখিয়ো, সম্পূর্ণ স্বচ্ছ জিনিষ এই পৃথিবীতে নাই। সব জিনিষের মধ্যে হয় ত তোমরা কাচকেই স্বচ্ছ বলিয়া মনে কর। কিন্তু যখন কাচের ভিতর দিয়া আলো আসে, তখন তাহারো কিছু অংশ কাচে আট্‌কাইয়া যায়। চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্রের আলো যখন পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, তখন তাহারো কিছু বাতাসে আট্‌কায়। যাঁহারা খুব উঁচু পাহাড়ে উঠিয়াছেন বা উড়ো জাহাজে চড়িয়া বেড়াইয়াছেন তাঁহারা বলেন, পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া দেখিলে যত

নক্ষত্র নজরে পড়ে, পাহাড়ের উপর হইতে দেখিলে তাহার চেয়ে অনেক বেশি নক্ষত্র দেখা যায়। কেন ইহা হয় বোধ করি তাহা তোমরা এখন নিজেরাই বলিতে পারিবে। গভীর বাতাসের ভিতর দিয়া আসিবার সময়ে ছোটো নক্ষত্রদের আলো বাতাসে আট্‌কাইয়া যায়, তাই সেগুলিকে পৃথিবীর উপর হইতে দেখা যায় না। দূরের গাছপালা পাহাড়-পর্ব্বত কত অস্পষ্ট দেখায়, তাহা তোমরা হয় ত লক্ষ্য করিয়াছ। যদি পৃথিবীর চারিধারে বাতাস না থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্র-সূর্য্যের আলো নিশ্চয়ই আমাদের কাছে আরো উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হইত এবং আকাশখানি রাত্রিতে আরো হাজার-হাজার নূতন নক্ষত্রে ভরিয়া উঠিত।

স্বচ্ছ জিনিষের কথা বলা হইল। অনচ্ছ জিনিষ যে পৃথিবীতে কত আছে, তাহা গুণিয়াই শেষ করা যায় না। ইট কাঠ মাটী পাথর লোহা তামা প্রভৃতি অনেক বস্তুই সাধারণ আলোতে অনচ্ছ। অর্থাৎ সেগুলির ভিতর দিয়া আলো আসিতে পারে না। কিন্তু মনে রাখিয়ো, সম্পূর্ণ অনচ্ছ জিনিষ এই পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সোনা এবং কাঠ অনচ্ছ জিনিষ। কিন্তু সেইগুলির যদি খুব পাতলা পাত তৈয়ারী করিয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে তাহার ভিতর দিয়া অল্প আলো আসিতে দেখা যাইবে।

মোটা কাগজ অনচ্ছ। কিন্তু সেই কাগজেই কয়েক ফোঁটা তেল লাগাইয়া পরীক্ষা করিলে তেল-লাগানো অংশের ভিতর দিয়া আলো আসিতে দেখা যায়। সাধারণ কাচের ভিতর দিয়া

যে-রকম আলো আসে, ঘষা কাচের ভিতর দিয়া সে-রকম আলো আসে না। তাই ঘষা কাচের ডোম্ ল্যাম্পে লাগাইলে আলোর তেজ কমে। যে-সব জিনিষের ভিতর দিয়া অল্প আলো যাওয়া-আসা করে সেগুলিকে বলা হয় অর্দ্ধস্বচ্ছ (Transluscent) বস্তু। কাজেই তেল-মাখানো কাগজ, ঘষা কাচ এবং পাতলা চীনামাটীর জিনিষকে অর্দ্ধ-স্বচ্ছ বলিতে হয়। তোমরা চিন্তা করিলে আরো দুই-চারিটি অর্দ্ধ-স্বচ্ছ জিনিষের নাম বলিতে পারিবে। কলা বা আমের পাতা মোটা পাতা অনচ্ছ, কিন্তু কচি পাতা অর্দ্ধস্বচ্ছ।

আলোর চলাচল ও ছায়া

বৈশাখ মাসের বিকালে যখন পশ্চিম আকাশে মেঘ করিয়া বিষম ঝড় আসে, তখন মেঘে-মেঘে কিরকমে বিদ্যুৎ ছুটাছুটি করে, তোমরা হয় ত সকলেই দেখিয়াছ। তখন বিদ্যুতের আলোর রেখা কখনো সাপের মতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া, কখনো বা তোমাদের মাঠের পথের মতো বাঁকা রাস্তায় চলে। ঘূর্ণি-ঝড়ে যখন বাগানের গাছপালা মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া পড়ে তখন ঝড়ের গতি কি-রকম থাকে তোমরা দেখ নাই কি? সে-সময়েও ঝড়ের দিক্ ঠিক্ থাকে না, তাহা পাগলের মতো এলোমেলো ভাবে ছুটাছুটি আরম্ভ করে। তাহা হইলে দেখ, বিদ্যুৎ ও বাতাস প্রায়ই সোজা পথে চলে না। বর্ষাকালে জলের গতিতেও আমরা তাহা দেখিতে পাই। নদীতে স্নানের সময়ে লক্ষ্য করিয়ো, দেখিবে, কোনো জায়গার জল সোজা ছুটিতেছে, আবার কোনো জায়গার জল ঘুরপাক খাইয়া চলিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আলো কখনো বাঁকা পথে চলে না। এখানে একটা ছবি দিলাম। দেখ, জানালার ভিতর দিয়া রৌদ্রের আলো কেমন সোজা পথে ঘরের মেজেতে পড়িয়াছে। সকাল বেলায় তোমাদের ঘরের পূবের জানালা খুলিয়া রাখিলে ঠিক্ এই রকমেই ঘরে রৌদ্র আসিতে দেখিবে। ভোরে সূর্য্য

উঠিয়াছে, কিন্তু তোমাদের শুইবার ঘরটির দরজা-জানালা বন্ধ আছে। এই সময়ে জানালার খুব ছোটো ফাঁক দিয়া কি-রকম পথে রৌদ্র আসে, তোমরা দেখ নাই কি? এই সময়ে যদি ধুলা বা রান্নার ধোঁয়া ঘরে আসে, তাহা হইলে বাহিরের রৌদ্র যে সতাই সোজা পথে ঘরে আসিতেছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

তোমাদের গ্রামের নদী বা খালের উপরে সাকো আছে কি-না জানি না। আমাদের ছোটো নদীটির উপরে সাঁকো আছে এবং তাহার মোটা-মোটা থাম নদীর জলে পোঁতা আছে। সাঁকোর কাছে স্নান করিবার সময়ে দেখিয়াছি, নদীর ঢেউ থামে বাধা পায় বটে, কিন্তু তাহা একেবারে আটকাইয়া যায় না। ঢেউ-

গুলি ঘুরিয়া-ফিরিয়া থামের পিছনে আসিয়া পড়ে। শীতকালে, তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া লেপ গায়ে দিয়া বিছানায় শুইয়া আছ। ওপাড়ায় বারোয়ারি পূজার যে ঢাক বাজিতেছে, তাহার শব্দ তোমাদের কানে আসিতেছে। সম্মুখের দরজা-জানালা বন্ধ, তবুও শব্দের ঢেউ ঘরে আসিতেছে। কাজেই বলিতে হয়, যেমন জলের ঢেউ বাধা এড়াইয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া থামের পিছনে আসে, তেমনি শব্দের ঢেউও সম্মুখের দরজা-জানালার বাধা না মানিয়া ঘুরিয়া পিছনে আসিতে পারে। কিন্তু আলোর ঢেউয়ে এই ব্যাপারটি সাধারণত একেবারেই দেখা যায় না। ইহা কখনই বাধা এড়াইয়া পিছনে যাইতে পারে না।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। মনে কর, তোমাদের পড়িবার টেবিলের উপরকার বাতিটি দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। তুমি যেন একখানা বই আলোর কাছে ধরিলে। ল্যাম্প হইতে যে আলোর ঢেউ বাহির হইয়া ছুটিতেছিল, তাহার কতকগুলি বইয়ে আটকাইয়া গেল। কিন্তু তাহা জলের ঢেউ বা বাতাসের ঢেউয়ের মতো বাধাকে ঘুরিয়া পিছনে যায় কি? কখনই যায় না। ইহার ফলে কি হয়, তাহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ,—বইয়ের পিছনে আলো যায় না, সেখানটা অন্ধকারে থাকিয়া যায়। তাই আলো ও ঘরের দেয়ালের মাঝে কোনো জিনিষ ধরিলে, দেওয়ালের গায়ে তাহার একটা ছায়া পড়ে।

ছায়া ব্যাপারটা যে কি, তাহা বোধ করি তোমরা এখন বুঝিতে পারিয়াছ। তোমাদের বাড়ীর প্রাচীরের ছায়া, ঘরের

ছায়া ঠিক আগেকার মতোই উৎপন্ন হয়। যদি জলের ঢেউয়ের মতো, শব্দের ঢেউয়ের মতো আলোর ঢেউ বাধাকে এড়াইয়া পিছনে ঘুরিয়া যাইতে পারিত, তাহা হইলে কি মুস্কিলই হইত একবার ভাবিয়া দেখ। তখন বৈশাখ মাসের রৌদ্রে পথ চলিতে-চলিতে গাছের ছায়ায় বসিয়া দু'দণ্ড বিশ্রাম করা যাইত না। ছাতা মাথায় দিলে রৌদ্রের ঢেউ ঘুরিয়া আসিয়া মাথায় পড়িত। কাজেই ছাতায় রৌদ্র আটকাইত না। লোকে রৌদ্রের সময়ে ছাতার ব্যবহার ছাড়িয়া দিত। এমন কি ঘরের ছাদ ও দরজা-জানালাও রৌদ্র আটকাইতে পারিত না। কি ভয়ানক অবস্থা হইত একবার ভাবিয়া দেখ।

যাহা হউক, আলোর রেখা ঠিক্ সোজা পথে চলে এবং সোজা পথে চলিতে-চলিতে কোনো অনচ্ছ জিনিষে বাধা পাইলে আট্‌কাইয়া ছায়া উৎপন্ন করে, এই কথাগুলি তোমরা মনে রাখিয়ো। আরো মনে রাখিয়ো, যে, সব স্বচ্ছ জিনিষের ঘনতা সব জায়গাতেই সমান, কেবল তাহারি ভিতর দিয়া আলো সোজা পথে চলে। মনে করা যাউক, একটি আলোক-রেখা যেন বাতাসের ভিতর দিয়া আসিয়া জলে প্রবেশ করিয়াছে। বাতাস ও জল দুই-ই স্বচ্ছ বস্তু, কিন্তু তাহাদের ঘনতা সমান নয়। বাতাসের চেয়ে জল ঘন। এই অবস্থায় বাতাসের ভিতর দিয়া যে-আলোর রেখা সোজা পথে আসিতেছিল, তাহা জলে প্রবেশ করিবার সময়ে বাঁকিয়া যাইবে। তা'ছাড়া আয়না বা ভালো পালিশ-করা ধাতুর উপরে পড়িলেও আলো ঠিক্‌রাইয়া বাঁকা পথে

চলে। এই সব বিষয়ের অনেক নূতন কথা তোমাদিগকে পরে বলিব।

আলোর রশ্মি যে ঠিক সোজা পথে চলে, তাহার আর একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা তোমাদিগকে বলিব। দরজা বা জানালার ছোটো ফাঁক দিয়া বাহিরের যে আলো অন্ধকার ঘরে আসে, তাহা বোধ করি তোমরা সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখ নাই। তোমরা ঘরের ভিতরে থাকিয়া এই রকম আলোতে একখানি সাদা কাগজ ধরিয়ো; দেখিবে বাহিরের গাছপালা ও লোকজনের একটা সুন্দর ছবি কাগজের উপরে পড়িয়াছে। ছবিটি ঠিক্ যেন ফোটোগ্রাফের ছবির মতো নিখুঁত, কিন্তু উল্‌টা ইহাতে গাছগুলার গোড়া উপরে ও মাথা নীচুতে এবং মানুষের পা উপরে ও মাথা নীচুতে দেখা যাইবে। তোমরা সুবিধা পাইলেই এই সহজ পরীক্ষাটি করিয়া দেখিয়ো। পর-পৃষ্ঠায় সেই রকম এক পরীক্ষার ছবি দিলাম। দেখ, অন্ধকারে ঘরের জানালার একটা ছিদ্র দিয়া বাহিরের আলো ঘরের দেওয়ালে পড়িয়াছে এবং তাহাতে বাহিরের বাড়ীর একটা সুন্দর ছবি দেওয়ালে দেখা যাইতেছে। কিন্তু ছবিতে বাড়ীর মাথা রহিয়াছে নীচে এবং গোড়া রহিয়াছে উপরে কেন এমন হয়, বলা কঠিন নয়। আলোর রশ্মি সোজা পথে চলে। তাই বাহিরেরর বাড়ীটির মাথার আলো ছিদ্র দিয়া দেওয়ালের নীচের দিকে পড়িতেছে এবং গোড়ার আলো সেই রকমে আসিয়া উপর দিকে পড়িতেছে। এই জন্যই ছবিখানিকে উল্‌টা দেখাইতেছে।

গাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়া যে-সূর্য্যের আলো গাছের তলায় পড়ে, তোমরা তাহা লক্ষ্য করিয়াছ কি? লক্ষ্য করিয়ো; দেখিবে, ফাঁক দিয়া আসিয়া সেই রৌদ্র যেন এক একটি টাকার আকারে
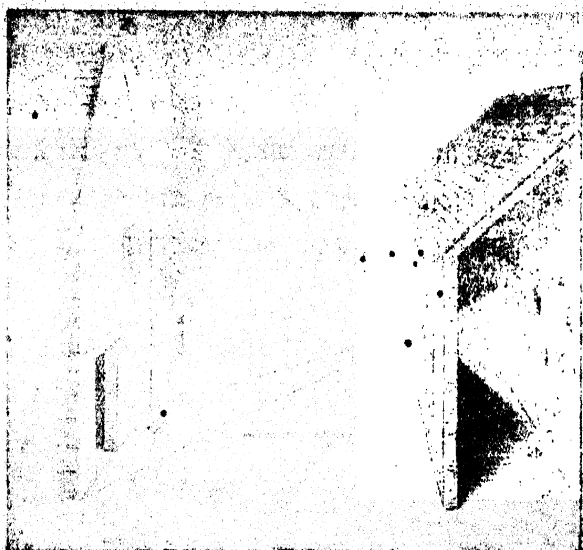
গাছতলায় বিছাইয়া আছে। জানালার ছোটো ছিদ্র দিয়া যখন সকাল বা বিকালের রৌদ্র অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে, তখন তাহাকেও গোলাকার দেখায়। কেন এমন হয়, তোমরা বোধ হয় এখন নিজেরাই বলিতে পারিবে। সূর্য্যের আকার গোল; কাজেই ছোটো ছিদ্র দিয়া যখন রৌদ্র সোজা পথে দেওয়ালে বা

মাটিতে পড়ে, তখন তাহাকেও গোল দেখায়। এগুলি যেন সূর্য্যের এক একটা ছবি। গ্রহণের সময়ে সূর্য্যের আকৃতি সম্পূর্ণ গোল থাকে না। ঐ সময়ে তোমরা যদি গাছতলার রৌদ্র পরীক্ষা করিতে পার, তবে দেখিবে, তখন সেগুলির আকৃতি টাকা বা পয়সার মতো সম্পূর্ণ গোল না হইয়া, তখনকার সূর্য্যের আকৃতির মতো খণ্ডিত হইয়া পড়িতেছে। সূর্য্য-গ্রহণ দেখিবার জন্য লোকে কাচে প্রদীপের কালি পাড়াইয়া সূর্য্যমণ্ডল পরীক্ষা করে। কেহ-বা জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখিয়া গ্রহণ হইয়াছে কি না জানিয়া লয়। এবারে যখন সূর্য্য-গ্রহণ হইবে, তখন ছোটো ছিদ্র দিয়া সূর্য্যের আলো অন্ধকারে ফেলিয়ো। ইহাতে গ্রহণ সুন্দর দেখা যাইবে।

পূর্ণচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া

আলোর সম্মুখে কোনো অনচ্ছ জিনিষকে ধরিলে কি-রকমে তাহার পিছনে ছায়া পড়ে, তোমাদিগকে সে-কথা আগেই বলিয়াছি। এখানে আবার তাহারি কথা বিশেষ-ভাবে তোমাদিগকে বলিব।

আমরা যে-সব জিনিষ হইতে আলো পাই; তাহাদের সকলের আকার সমান নয়। যে সূর্য্য হইতে আমরা দিনের আলো পাই, তাহা একটা প্রকাণ্ড বস্তু। ইহার সকল অংশ হইতে আলো বাহির হইয়া পৃথিবীতে পড়ে। বিদ্যুতের আর্ক লাইট্ (Arc Light) ছোটো জিনিষ। তাই এই আলো দেখিলে মনে হয়, যেন একটা ছোটো বিন্দু হইতে বাহির হইয়া ইহার আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এক গাদা খড়ে আগুন দিলে বা মোটা মশাল জ্বালাইলে যে আগুন হয়, তাহা প্রকাণ্ড। কিন্তু একটা মোমবাতি জ্বালাইলে যে আগুন পাওয়া যায়, তাহাকে সে-রকম বড় দেখায় না। বড় জিনিষের আলোতে যে ছায়া হয় তাহার সহিত ছোটো জিনিষের আলোর ছায়া তোমরা বোধ করি তুলনা করিয়া দেখ নাই। এই দুই ছায়া ঠিক একই রকম হয় না। প্রদীপ জ্বালাইয়া দেয়ালের খুব কাছে একখানি বই ধরিলে দেওয়ালে যে ছায়া পড়ে তাহা খুব নিবিড় ও সুস্পষ্ট। কিন্তু এক গাদা খড়ে আগুন দিলে যে আলো হয়, তাহার ছায়া কখনই

সে-রকমটি হয় না। খুব বড় আলোর ছায়া কখনই নিবিড় ও সুস্পষ্ট দেখায় না। বেলা দুপুরে মাথার উপর দিয়া একটা কাক উড়িয়া গেল এবং মাটির উপরে কাকের ছায়া পড়িল। এই ছায়া এত অস্পষ্ট হয় যে, তাহাকে ছায়া বলিয়াই চেনা যায় না। তোমরা ইহা লক্ষ্য কর নাই কি? কিন্তু সন্ধ্যা বেলায় ঘরের কোণে যে মাটার প্রদীপখানি মিটমিট্ করিয়া জ্বলে, তাহার কাছে বই বা অন্য কিছু ধরিলে দেওয়ালের গায়ে সুস্পষ্ট কালো ছায়া পাওয়া যায়। কেন বড আলোর ছায়া অস্পষ্ট ও ছোটো আলোর সুস্পষ্ট হয়, তোমাদিগকে সে-সম্বন্ধে কিছু বলিব।
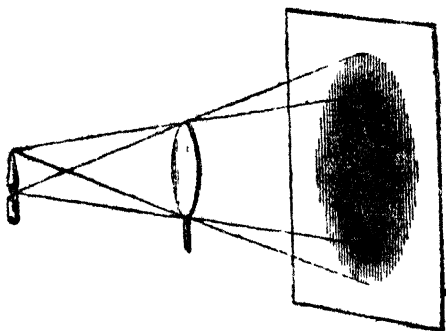
উপারে একটা ছবি দিলাম। দেখ, ছবিতে একটা ছোটো বাতি জ্বালানো রহিয়াছে, সম্মুখে একটা গোলা আছে এবং তাহার খুব কাছে একটা সাদা পর্দ্দা লাগানো আছে। বাতি হইতে আলোর রশ্মি বাহির হইয়া চারিদিকে অবাধে ছুটিয়া চলিতেছে,

কিন্তু যে-রশ্মিগুলি গোলাতে বাধা পাইতেছে, সে-গুলি গোলার পিছনে যাইতে পারিতেছে না। কাজেই, পর্দ্দার উপরে গোলার একটা নিবিড় গোলাকার ছায়া পড়িয়াছে। এই ছায়াকেই আমরা পূর্ণচ্ছায়া (Umbra) বলিতেছি। পূর্ণচ্ছায়া এত নিবিড় যে, প্রদীপ হইতে তাহার উপরে একটুও আলো পড়ে না।

কোনো জিনিষের ছায়াকে ইচ্ছামত ছোটো বা বড় করিতে পারা যায়, ইহা তোমরা দেখ নাই কি? ঘরে যখন প্রদীপ জ্বলিবে তখন একখানি বইকে আলোর খুব কাছে ধরিয়ো ; দেখিবে, দেওয়ালে বইয়ের একটা প্রকাণ্ড ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই ছায়া খুব নিবিড় নয়। তার পরে বইখানিকে আলো হইতে দূরে ঠিক্ দেওয়ালের কাছে লইয়া পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, এখনকার ছায়া খুব ছোটো এবং নিবিড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেওয়ালের কাছে কোনো জিনিষ রাখিলে কেন তাহার ছায়া ছোটো ও নিবিড় হয় এবং পরে সেই জিনিষটাকে দেওয়াল হইতে দূরে অর্থাৎ আলোর কাছে লইয়া গেলে কেন তাহাই আবার অস্পষ্ট ও বড় হয়, তাহা তোমরা আগেকার ছবিটি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

ছবিতে দেখ, গোলাকার ছায়া মন্দিরের চূড়ার মতো পথে চলিয়াছে। কিন্তু চূড়াকার ছায়ার সরু দিক্‌টা আছে আলোর কাছে। কিন্তু চূড়াকার জিনিষের চূড়ার কাছের বেড়, দূরের বেড়ের চেয়ে ছোটো হয় না কি? এই জন্যই পর্দ্দাকে যতই আলোর কাছ হইতে দূরে লওয়া যায়, ততই ছায়ার বেড় বাড়িয়া চলে।

ভিতরে এবং উপচ্ছায়া থাকে তাহার চারিপাশে। খড়ের বড় গাদায় আগুন জ্বলিলে প্রাচীরের গায়ে যে-ছায়া পড়ে এবং মাথার উপর দিয়া চিল বা কাক উড়িয়া গেলে মাটিতে যে-ছায়া পড়ে, সেগুলি কেন অস্পষ্ট দেখায় তোমরা বোধ হয় তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছ। পূর্ণচ্ছায়ার চারিপাশে উপচ্ছায়া থাকে বলিয়াই ঐ সকল ছায়া এত অস্পষ্ট।

আবার ছবিটি লক্ষ্য কর। মনে করা যাউক, যেন, ছবিতে আঁকা পর্দ্দাখানিকে আমরা ক্রমেই আলোর কাছে অর্থাৎ বাঁ-দিকে সরাইয়া লইতেছি। এখন পূর্ণচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার অবস্থা কি হইবে বলা যায় না কি? ছবি দেখিলেই বুঝিবে, ইহাতে ঐ দুই ছায়া আকারে ছোটো হইতে থাকিবে এবং শেষে উপচ্ছায়া এত ছোটো হইবে যে, তাহাকে হয় ত চেনাই যাইবে না। আবার মনে করা যাউক, পর্দ্দাখানিকে আমরা যেন আলো হইতে দূরে লইয়া যাইতেছি। এই অবস্থায় কি হইবে, তোমরা হয় ত নিজেরাই বলিতে পারিবে। তখন উপচ্ছায়া বাড়িয়া চলিবে এবং পূর্ণচ্ছায়া অস্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইবে।

পূর্ণচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার পরীক্ষার জন্য বিশেষ যন্ত্রের দরকার হয় না। ভোরে বা বিকালে তোমাদের বাড়ীর প্রাচীরের গায়ে যখন রৌদ্র পড়িবে, তখন প্রাচীর হইতে পাঁচ-ছয় ফুট তফাতে হাত রাখিয়া হাতের ছায়া প্রাচীরের গায়ে ফেলিয়ো। দেখিবে, দেওয়ালে হাতের ছায়া পড়িতেছে বটে, কিন্তু স্পষ্ট নয়,—বোধ হইবে যেন হাতের হাড়েরই ছায়া দেওয়ালে পড়িতেছে।

পূর্ণচ্ছায়ার সঙ্গে উপচ্ছায়াই বেশী থাকে বলিয়া ইহা ঘটে। এখন হাতখানিকে দেওয়ালের খুব কাছে লইয়া যাও। দেখিবে, এখনকার ছায়া আর আগেকার মতো অস্পষ্ট নাই। তোমার হাতের সুন্দর আকৃতি ছায়ায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। দেওয়ালের খুব কাছে হাত রাখায় উপচ্ছায়া বেশী হইল না। তাই পূর্ণচ্ছায়া সুস্পষ্ট দেখা গেল।

মাথার চুল কত সরু জিনিষ, তাহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। রৌদ্রে উঁচু করিয়া ধরিয়া তোমরা মাটিতে চুলের ছায়া ফেলিতে পার কি? এই রকমে কখনই চুলের ছায়া ফেলা যায় না। একখানি সাদা কাগজের খুব কাছে একগাছি চুল রাখিয়া পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, রৌদ্রতে কাগজের উপরে তাহার সুন্দর ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু কাগজ হইতে সেটিকে তিন-চারি ইঞ্চি তফাতে লইয়া গেলে আর ছায়া দেখা যাইবে না। কেন ইহা ঘটে, তোমরা বোধ করি এখন তাহা নিজেরাই বলিতে পারিবে।
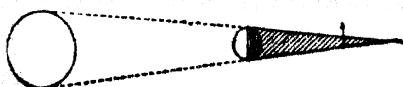
উপরে যে ছবিটি দিলাম লক্ষ্য কর। দেখ, যে-সাদা উজ্জ্বল জিনিষ হইতে আলো আসিতেছে তাহা বড় এবং যে অনচ্ছ জিনিষটি মাঝে থাকিয়া ছায়া ফেলিতেছে, তাহা উহার তুলনায় ছোটো। ছবি দেখিলেই বুঝিবে, পর্দ্দাখানিকে যতই আলো

হইতে তফাতে লইয়া যাওয়া হয়, ততই ছায়া ছোটো হইতে আরম্ভ করে এবং শেষে পর্দ্দাটিকে খুব দূরে লইয়া গেলে মাঝের জিনিষের পূর্ণচ্ছায়া পর্দ্দার উপরে একেবারেই পড়ে না। তখন পর্দ্দায় দেখা যায় কেবল একটা বড় উপচ্ছায়া; কিন্তু চারিপাশের আলোতে এই ছায়াকে চেনা কঠিন হয়। কাজেই পর্দ্দায় দূরের ছোটো জিনিষের কোনো ছায়াই নজরে পড়ে না। আলো আছে, অথচ তাহার ছায়া নাই একথা সহজে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু ইহা সত্য। আমরা ছেলে-বেলায় গল্প শুনিতাম, পুরীর জগন্নাথ দেবের যে-মন্দির আছে, তাহার সব চেয়ে উঁচু চূড়ার ছায়া মাটিতে পড়ে না। কথাটা বিশ্বাস হইত না। কিন্তু ইহাতে অবিশ্বাসের কিছুই নাই। মন্দিরের চূড়ার আগা খুব উপরে আছে বলিয়া, সূর্য্যের আলোতে তাহার পূর্ণচ্ছায়া মাটিতে পড়ে না, মাটিতে পড়ে কেবল তাহার খুব ফিকে উপচ্ছায়া। আকাশের খুব উঁচুতে যখন চিল, শকুন, পায়রা প্রভৃতি পাখীরা উড়িয়া বেড়ায়, তখন ঐকারণে তাহাদেরো ছায়া মাটিতে পড়ে না। তোমরা বোধ করি ইহা লক্ষ্য কর নাই। কিন্তু আমরা অনেক পরীক্ষা করিয়াও ছায়া দেখিতে পাই নাই। তোমরা যখন ঘুড়ি উড়াও, তখন ঘুড়ির ছায়া মাটিতে পড়িতে দেখিয়াছ কি? যখন অল্প উঁচুতে ঘুড়ি উড়ে তখন তাহার ছায়া মাটিতে পড়ে, কিন্তু খুব উঁচুতে উঠিলে সেই ছায়া আর দেখা যায় না। ঘুড়ি উড়াইবার সময়ে তোমরা এই পরীক্ষাটি করিয়ো।

আলোর তেজ

আলো হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, তাহার তেজ ততই কমিয়া আসে। ইহা তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ। টেবিলের উপরে ল্যাম্প রাখিয়া আমরা সন্ধ্যার সময়ে পড়িতে বসিয়াছি। বেশ পড়া যাইতেছে। এখন সেই ল্যাম্পটিকেই যদি পাঁচ-সাত হাত তফাতে রাখা যায়, তাহা হইলে কি হয়, তোমরা পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, আগে ল্যাম্পের কাছে বই রাখিয়া যেমন অনায়াসে বই পড়া যাইতেছিল, এখন তাহা যাইতেছে না। ল্যাম্পটিকে কুড়ি হাত তফাতে লইয়া যাও, দেখিবে, আলোর জোর আরো কমিয়া আসিয়াছে। এই আলোতে বই পড়ার কাজ একেবারেই চলিতেছে না। ল্যাম্পকে আরো দূরে লইয়া যাও, দেখিবে, আলো এত কমিয়া আসিয়াছে যে, টেবিলের কোন্ বইখানা কোথায় আছে, তাহাও চেনা যাইতেছে না। সুতরাং বলিতে হয়, আলো যত দূরে যায়, তাহার তেজ ততই কমিতে থাকে। কিন্তু দূরত্ব অনুসারে আলোর তেজ কোন্ নিয়মে বাড়ে বা কমে, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া ইহার একটি সুন্দর নিয়ম বাহির করিয়াছেন। এখন তোমাদিগকে তাহারি কথা বলিব। নিয়মটি বড় মজার।

মনে কর, এক হাত তফাতে বাতি জ্বলিতেছে, আমরা যেন তাহার আলোকে বই পড়িতেছি। দুই হাত তফাতে লইয়া গেলে

সেই বাতির তেজ কত কমিবে তোমরা বলিতে পার কি ? হয় ত বলিবে, এক হাত তফাতের বাতিকে দুই হাত তফাতে লইয়া গেলে তেজ অর্দ্ধেক হইবে ; তিন হাত তফাতে লইয়া গেলে তিন ভাগের এক ভাগ হইবে। কিন্তু তাহা নয়। এক হাত তফাতের বাতিকে দুই হাত দূরে লইয়া গেলে $\frac{১}{৪}$ অর্থাৎ সিকি আলো পাওয়া যায় ; তিন হাত তফাতে লইয়া গেলে $\frac{১}{৯}$ অর্থাৎ নয় ভাগের এক ভাগ মাত্র আলো আসে। এই রকমে বলা যায়, চারি হাত তফাতে $\frac{১}{১৬}$, পাঁচ হাত তফাতে $\frac{১}{২৫}$ মাত্র আলো পাওয়া যায়। তাহা হইলে দেখ, জ্বলন্ত বাতিকে দূরে সরাইয়া রাখিলে কি পরিমাণে আলোর তেজ কমে, তাহার একটা নিয়ম পাওয়া গেল। এখন আমাদের সম্মুখে যে-আলোটি জ্বলিতেছে, তাহাকে দ্বিগুণ দূরে লইয়া গেলে $\frac{১}{৪}$ তিনগুণ দূরে $\frac{১}{৯}$, চারিগুণ দূরে $\frac{১}{১৬}$ দশগুণ দূরে $\frac{১}{১০০}$ ইত্যাদি আলো পাওয়া যাইবে। আবার দূরের আলো-কে কাছে আনিলেও সেই অনুপাতে তেজ বাড়িয়া চলে। বারো হাত তফাতে যে আলো আছে, তাহার দূরত্বকে অর্দ্ধেক অর্থাৎ ছয় হাত করিলে আলো চারি গুণ হয় ; $\frac{১}{৩}$ অর্থাৎ চারি হাত করিলে আলো নয় গুণ হয়। এই সব পরীক্ষা হইতে বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন, আলোর তেজ দূরত্বের বর্গের বিলোম অনুপাতে বাড়ে বা কমে। দেখ, নিয়মটি কেমন সুন্দর ! কোনো জায়গায় এই নিয়মের অন্যথা হয় না। তোমার হাতের লণ্ঠনের আলো, আবার প্রায় সাড়ে নয় কোটি মাইল দূরের সূর্য্যের আলো, ঠিক্ এই নিয়ম মানিয়াই ছুটাছুটি করে।

নিম্নে একটা ছবি দিলাম। দেখ, ছবিতে দুইটা পর্দ্দা রহিয়াছে। একটি পর্দ্দার সম্মুখে এক হাত তফাতে একটি বাতি জ্বলিতেছে। অপর পর্দ্দার সম্মুখে দুই হাত তফাতে চারিটি বাতি জ্বালানো আছে। এখন যদি দুইটি পর্দ্দার উপরকার আলোর তেজ পরীক্ষা কর, তাহা হইলে দেখিবে, এক হাত তফাতের একটি হইতে যে আলো প্রথম পর্দ্দায় পড়িতেছে দুই হাত তফাতের চারিটি বাতিতে দ্বিতীয় পর্দ্দায় অবিকল সেই আলোই পড়িতেছে। অর্থাৎ
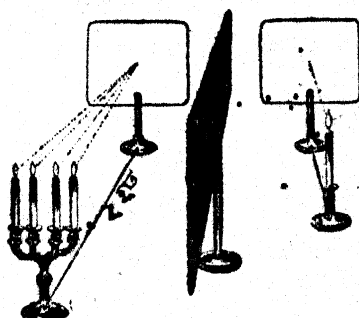
দূরত্ব অর্দ্ধেক করায় চারিটি বাতির আলো একটি বাতিতেই পাওয়া যাইতেছে। দূরত্ব অনুসারে আলোর কম-বেশী হওয়ার যে-নিয়মের কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি, এই পরীক্ষায় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, আলো হইতে দূরে গেলে তাহার তেজ কমে কেন? ইহার উত্তর কঠিন নয়। ফুলঝুরি লইয়া তোমরা অনেকেই হয়ত খেলা করিয়াছ। আগুন দিলেই

ইহার উপরে-নীচে, বায়ে-দক্ষিণে এবং আশে-পাশে সব দিকেই সুন্দর আলোর রেখা দেখা যায়। যখন আমরা কোনো আলো জ্বালি, তখন তাহা হইতেও ঐরকমে লক্ষ-লক্ষ, কোটী-কোটী আলোর রশ্মি বাহির হইয়া দূরে চলিতে আরম্ভ করে এবং যত দূরে যায় ততই সেই রশ্মিগুলির মধ্যেকার ব্যবধান বেশী হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই, আলোর খুব কাছে কোনো জিনিষ রাখিলে তাহাতে যতগুলি রশ্মি বাধা পায়, দূরে লইয়া গেলে তাহাতে অনেক কম রশ্মি আসিয়া ঠেকে। কাজেই, কাছের জিনিষের চেয়ে দূরের জিনিষকে অল্প আলোকিত দেখা যায়।

বোধ হয়, তোমরা কথাটা বুঝিলে না। একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। তোমরা মহাভারতে পড়িয়াছ, যুদ্ধের সময়ে বড় বড় বীরেরা তীর-ধনুক হাতে করিয়া রাজাকে ঘিরিয়া থাকিতেন। শত্রু কাছে আসিলে তাঁহারা ঘন ঘন তীর ছুঁড়িতেন। মনে কর, তোমরা পাঁচ সাত জন একত্র গোলাকারে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে অবিরাম তীর ছুঁড়িতে থাকিলে। আলোর রশ্মি যেমন প্রদীপ হইতে বাহির হইয়া সব দিকে ছুটিতে থাকে, তোমাদের তীরগুলিও যেন সেই রকমে ছুটিতে লাগিল। এখন মনে কর, তোমাদেরই মধ্যে একজন মহাবীর ঢালে শরীর ঢাকিয়া দূর হইতে তীরন্দাজদের কাছে আসিতে লাগিল এবং তোমাদের তীর ঢালে ঠেকিয়া খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল। বেশি তীর ঢালে ঠেকিবে কোন্ জায়গায়? তোমাদের ব্যূহের কাছে না দূরে? ব্যূহ হইতে বাহির হইয়া তীরগুলি যতই দূরে যাইতেছে, সেগুলি ততই পরস্পর

ফাঁক হইয়া পড়িতেছে। কাজেই, চালে বেশি তীর ঠেকিবে বৃ্হের কাছে এবং কম তীর ঠেকিবে দূরে। প্রদীপ হইতে আলোর রশ্মি, তীরের মতোই সব দিকে ছুটিয়া চলে, কাজেই, দূরের জিনিষের চেয়ে কাছের জিনিষে যে বেশি রশ্মি পড়িবে, তাহা বুঝা যায় না কি? কিন্তু কোনো প্রদীপ হইতে আলোর রশ্মি যদি সমান্তরাল ভাবে বাহির হইয়া একদিকে ছুটিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে ইহা হয় না। তোমরা সকলেই জানো, সমান্তরাল রেখার পরস্পর ব্যবধান কখনই কম বা বেশী হয় না। কাজেই, প্রদীপের সমান্তরাল রশ্মির যতগুলি কাছের জিনিষে ঠেকে, দূরের জিনিষে অবিকল ততগুলিই ঠেকে। তাই সমান্তরাল আলোতে কাছের ও দূরের জিনিষে একই ভাবে আলো পড়ে। অর্থাৎ দূরে যাওয়াতে এই রকম আলোর তেজ কমে না। সমান্তরাল আলো তোমরা দেখ নাই কি? গোয়ালন্দ ও কলিকাতার গঙ্গার ষ্টীমার হইতে যে সার্চলাইট্ ফেলা হয়, তাহা তোমাদের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ দেখিয়াছ। সার্চ-লাইটের যে লণ্ঠন থাকে, তাহা হইতে সমান্তরাল আলোর রশ্মি বাহির হয়। তাই তিন-চারি মাইল দূরে গিয়েও সে আলো না কমিয়াই ছুটিয়া চলে।

আলোর তেজ সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমাদিগকে বলিয়াছি। এখনো কিন্তু আর একটি বিষয় বলিতে বাকি রহিয়াছে। দোকানে ল্যাম্প কিনিতে গেলে, দোকানদার অনেক ল্যাম্প বাহির করিয়া দেখায় এবং কোনোটার জোর পঞ্চাশ বাতি, কোনোটার দুই শত

বাতি ইত্যাদি পরিচয় দেয়। যে-ল্যাম্পের আলোর জোর বেশি থাকে, তাহার দামও বেশি হয়। তোমাদের কাহারো কাহারো বাড়ীতে হয়ত বিদ্যুতের আলো জ্বলে। বিদ্যুতের বাতির মধ্যেও কোনোটির তেজ বেশি এবং কোনোটির কম থাকে। তোমাদের পড়িবার ঘরে যে আলো জ্বলে, তাহার জোর হয় ত আশী বাতি এবং সিঁড়ির ঘরে বা স্নানের ঘরে যে-বাতি থাকে, তাহার জোর হয়ত পনেরো বাতি। কেমন করিয়া আলোর জোর ঠিক্ করা হয়, এখন সেই কথাগুলি তোমাদিগকে বলিব।

কোনো জিনিষের ওজন ঠিক করিতে হইলে কি করা হয়, তোমরা সকলেই তাহা জানো। দাঁড়িপাল্লার এক দিকে জিনিষ-টিকে চাপাইয়া অন্য দিকে বাট্খারা রাখিতে হয়। কত সেরা বাটখারায় দাঁড়িপাল্লা দাঁড়ি ঠিক্ সোজা হইয়া দাঁড়াইল দেখিয়া জিনিষের ওজন জানা যায়। তাহা হইলে দেখ, এক-সেরা দুই-সেরা পাঁচ-সেরা ইত্যাদি নানা বাটখারার ভারের সঙ্গে জিনিষটার ভারের তুলনা করিলে তাহার ভার জানা যায়। তোমাদের পড়ার টেবিলে যে ল্যাম্পটি জ্বলিতেছে তাহার আলোতে কত বাতির জোর আছে ঠিক্ করিতে ঐরকমে একটা নির্দ্দিষ্ট বাতির আলোর সঙ্গে ল্যাম্পের আলোর তুলনা করিতে হয়। যদি দেখা যায়, নির্দ্দিষ্ট বাতির তুলনায় ল্যাম্পের আলো কুড়ি গুণ, তাহা হইলে বলিতে হয়, উহার আলোর জোর কুড়ি বাতির সমান। আলোর তেজ তুলনা করার নানা উপায় আছে। সেগুলির মধ্যে তোমা-দিগকে কেবল একটির কথা বলিব।

একখানি পরিষ্কার কাগজে এক বিন্দু তেল ফেলিলে কি হয়, তোমরা সকলেই তাহা দেখিয়াছ। তেলটুকু ছড়াইয়া গিয়া সেই জায়গাটাকে অর্দ্ধ-স্বচ্ছ করে। রাত্রিতে প্রদীপের আলো এইরকম কাগজে ফেলিলে তেল-লাগা কাগজটাকে কালো দেখায়। কিন্তু যদি কাগজের পিছনে প্রদীপ রাখিয়া পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে সেই জায়গাটাই উজ্জ্বল হইয়া পড়ে। আবার দুইটি সমান তেজের প্রদীপের মাঝে রাখিয়া পরীক্ষা করিলে, তেল-মাখানো জায়গাটাকে চেনাই যায় না,—উহা তখন কাগজের অপর অংশের সঙ্গে যেন একরঙা হইয়া যায়। এখানে তিনখানি ছবি দিলাম। তেলমাখানো কাগজ ও আলো সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তোমরা ছবিগুলি দেখিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে তোমরা
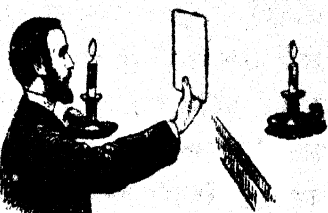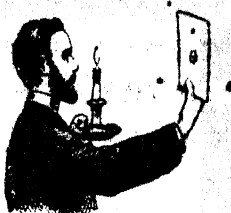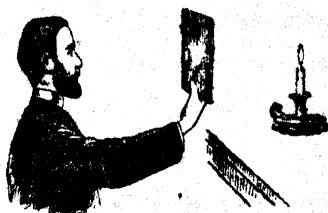
একখানি পরিষ্কার সাদা কাগজে এক বিন্দু তেল ফেলিয়া আলোতে ধরিয়া পরীক্ষা করিয়ো।

একটা নির্দিষ্ট ল্যাম্পের আলোর সঙ্গে অন্য ল্যাম্পের আলোর তেজ তুলনা করিতে হইলে ল্যাম্প দু'টিকে পরস্পর দূরে রাখিয়া ঐরকম একখানা তেল মাখানো কাগজকে মাঝে রাখিতে হয়। তা'র পরে যতক্ষণ পর্যান্ত কাগজের এ-পিঠের আলো ও-পিঠের আলোর ঠিক্ সমান না হয়, ততক্ষণ কাগজখানিকে এদিকে-ওদিকে সরাইতে হয়। দুই পিঠের আলো সমান হইতেই সেই তেলের দাগটা চেনাই যায় না। মনে কর, তোমাদের পড়ার ল্যাম্প এবং একটা মোমবাতির মাঝে ঐরকম একখানা কাগজকে এদিক-ওদিক সরাইয়া এমন একটা জায়গা পাওয়া গেল, যেখানে কাগজের তেলের দাগ চেনা গেল না। এখন যদি তোমরা কাগজ হইতে মোমবাতি ও ল্যাম্পের দূরত্ব মাপিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের ল্যাম্প হইতে কতগুলি মোম বাতির সমান আলো বাহির হইতেছে, তাহা সামান্য হিসাবে বলিয়া দিতে পারিবে। মনে করা যাউক, এই পরীক্ষায় যেন মাঝের কাগজ হইতে মোম বাতিটি দুই হাত এবং ল্যাম্প চারি হাত তফাতে আছে। দুইয়ের বর্গ চার এবং চারের বর্গ ষোল। আবার ষোল, চারেরই চারি গুণ। ইহাতে জানা গেল ল্যাম্পটি মোম বাতির তুলনায় চারিগুণ বেশি আলো দিতেছে। সুতরাং মাঝের কাগজ হইতে দুইটি আলোর দূরত্বের বর্গ কত হইল হিসাব করিলে আলো দুইটির তেজ তুলনা করা যায়। তোমাদের বাড়ীতে যে কুড়ি,

চল্লিশ ও আশী বাতির বিদ্যুতের আলো আছে, সেগুলির আলোর তেজ এই রকম কোন উপায়েই ঠিক্ করা হইয়াছিল। এখন চেষ্টা করিলে তোমরাও যে-কোনো দুইটি বাতির আলোর তেজ তুলনা করিতে পারিবে।

আলোর বেগ

রেলগাড়ী এক ষ্টেশন হইতে অন্য ষ্টেশনে যাইতে সময় লয়। ডাকগাড়ি ঘণ্টায় পঞ্চাশ ষাট মাইল বেগে চলে। আবার ঘণ্টায় পনেরো ষোল মাইল চলে, এমন গাড়িও অনেক আছে। খেলার সময় যখন তোমরা ফুট্‌বলের পিছনে ছুটিয়া এক গোলের কাছ হইতে অন্য গোলের কাছে হাজির হও, তখনো তোমাদের চলিতে সময় লাগে। তখন তোমরা হয় ত ঘণ্টায় পাঁচ বা ছয় মাইল বেগে চলিতে থাকো। তুমি এখানে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিলে আমি পাঁচ শত গজ তফাতে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিলাম। এই চীৎকারের শব্দও এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইতে একটু সময় লয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, বাতাসের ভিতর দিয়া শব্দ সাধারণতঃ সেকেণ্ডে ১১২০ ফিট্ বেগে ছুটিয়া চলে। বৈজ্ঞা-নিকেরা বলেন, রেলের গাড়ির যেমন বেগ আছে, শব্দের যেমন বেগ আছে, তেমনি আলোরও বেগ আছে। তুমি সন্ধ্যার সময়ে ঘরে যে প্রদীপ জ্বালিলে, তাহার আলো ঘরের চারিদিকে ছড়াইয়া যাইতে একটু সময় লয়, মাঠের ওপারের কুঁড়ে ঘরখানি হইতে প্রদীপের যে ক্ষীণ আলো তোমাদের চোখে আসিয়া পড়িতেছে, তাহাও মাঠ পার হইয়া তোমার কাছে আসিতে সময় লয়। তোমরা হয় ত বলিবে, প্রদীপ জ্বালিবামাত্র সমস্ত ঘর আলোতে পূর্ণ হইয়া পড়ে, আলোর বেগ ত বুঝা যায় না? ইহার উত্তরে এই

বলা যায় যে, আলো ঘণ্টায় দশ বিশ বা একশত মাইল বেগে চলে না। ইহা চলে প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ নব্বই হাজার মাইল অর্থাৎ প্রায় একলক্ষ ক্রোশ। সুতরাং দশ বা পনেরো হাত ঘরের এক কোণ হইতে অন্য কোণে যাইতে আলো যে একটু সময় লয় তাহা এত অল্প যে, বুঝাই যায় না। তাই তোমরা আলোর বেগ বুঝিতে পার না। পৃথিবীতে কোন্ জিনিষ বেশী বেগে চলে তোমরা বলিতে পার কি? তোমরা হয়ত বলিবে, রেলের গাড়ি খুব জোরে চলে। কিন্তু তাহার চেয়েও বেশী জোরে চলে এরোপ্লেন। ইহা ঘণ্টায় এক শত মাইল্ বেগেও চলিতে পারে। কামানের গোলাও কম বেগে চলে না। ইহাকে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় এক হাজার ফিট্ করিয়া ছুটিতে দেখা যায়। সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটী ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে আছে। পৃথিবী হইতে কামান ছুড়িয়া একটা গোলাকে সূর্য্যে ফেলিতে গেলে প্রায় আঠারো বৎসর ধরিয়া না চলিলে তাহা সূর্য্যে পৌঁছায় না। কিন্তু সূর্য্যের আলো এত বড় রাস্তাটা পার হইয়া আট মিনিট আট সেকেণ্ডে পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছায়। ভাবিয়া দেখ, আলো কত তাড়াতাড়ি চলে। আর একটা হিসাবের কথা বলি। পৃথিবীর বেড় প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল। তাই রেলের গাড়িকে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে দিবারাত্রি চালাইয়া একবার বেড় দিতে গেলে প্রায় একুশ দিন লাগে। কিন্তু আলো এক সেকেণ্ডে পৃথিবীকে সাড়ে সাত বার বেড় দিয়া আসিতে পারে। রাত্রিতে তোমরা আকাশে যে-সব নক্ষত্রকে মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতে দেখ,

সেগুলি যে, কত দূরে আছে বোধ করি তোমাদের তাহার আন্দাজ নাই। যেটি আমাদের খুব কাছের নক্ষত্র, পৃথিবী হইতে তাহার দূরত্ব সূর্য্যের দূরত্বেরও প্রায় দুই লক্ষ তেষট্টি হাজার গুণ বেশী। ইহার আলো পৃথিবীতে আসিতে তিন বৎসরেরও বেশী সময় লয়। ইহা ছাড়া যাহাদের আলো পৃথিবীতে পৌঁছিতে দশ বিশ, পঞ্চাশ বা এক শত বৎসরেরও বেশী সময় লয় এমন নক্ষত্রও আকাশে হাজার হাজার আছে।

যাহা হউক, আলোর বেগ কি রকমে বাহির করা হয় এখন তোমাদিগকে তাহাই বলিব। এক ষ্টেশন হইতে অন্য ষ্টেশনে যাইতে রেলগাড়ির কত সময় লাগে; তাহা ঘড়ি দেখিয়া ঠিক্ করা যায় এবং তা'র পরে দূরত্বকে সময়ের পরিমাণ দিয়া ভাগ দিলে গাড়ি কত বেগে চলিতেছে জানা যায়। কিন্তু আলোর বেগ এত সহজে ঠিক্ করা চলে না। যাহা সেকেণ্ডে এক লক্ষ নব্বই হাজার মাইল চলে, তাহাকে লইয়া পরীক্ষা করার জায়গা এই ছোটো পৃথিবীতে নাই। তাই প্রথমে আকাশে আলোর চলা-ফেরা দেখিয়া তাহার বেগ স্থির করা হইয়াছিল।

তোমরা বোধ হয় জান, বুধ বৃহস্পতি শুক্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কেরা সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সব জ্যোতিষ্কের নাম গ্রহ। পৃথিবীও এক বৎসরে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে; ইহাও একটা গ্রহ। কিন্তু চাঁদকে গ্রহ বলা যায় না। চাঁদ ঘোরে পৃথিবীর চারিদিকে। যাহারা গ্রহের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে বলা হয় উপগ্রহ। পৃথিবীর যেমন উপগ্রহ আছে,

তেমনি বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহদেরও উপগ্রহ আছে, চাঁদ ঘুরিতে ঘুরিতে যখন পৃথিবীর ওদিকে ছায়ার আড়ালে প্রবেশ করে তখন চাঁদের গ্রহণ হয়। অন্য গ্রহদের উপগ্রহগুলিরও ঐরকম গ্রহণ দেখা যায়। ছোটো দূরবীণ দিয়া বৃহস্পতির একটি উপগ্রহের গ্রহণ আমরা অনেক বার দেখিয়াছি। এই উপগ্রহটি ঘুরিতে ঘুরিতে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের শেষে বৃহস্পতির ওদিকের ছায়ায় গিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

এখানে একটা ছবি দিলাম। দেখ, 'সূ' চিহ্নিত সূর্য্য
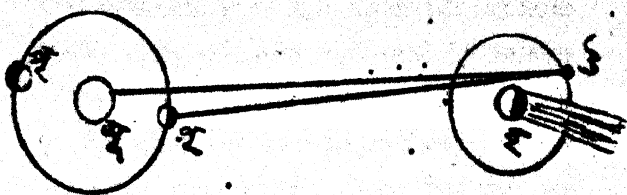
মাঝে আছে, এবং 'পৃ' চিহ্নিত পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব যত 'বৃ' চিহ্নিত বৃহস্পতির দূরত্ব তার চেয়ে অনেক বেশী। এই জন্য বৃহস্পতি যে-সময়ে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে, তখন পৃথিবী সূর্য্যকে বারো বার ঘুরিয়া আসে। তাই বলা হয় বৃহস্পতির এক বৎসর পৃথিবীর বারো বৎসরের সমান। ইহাতে পৃথিবী গোলাকার পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে গিয়া প্রতিবৎসরেই এক-একবার বৃহস্পতির কাছে আসে, এবং এক-একবার খুব দূরে চলিয়া যায়। মনে কর, ছবিতে পৃথিবী ডাইনের দিকে 'পৃ' চিহ্নিত জায়গায় দাঁড়াইয়া যখন বৃহস্পতির

খুব কাছে আসিয়াছে তখন যেন বৃহস্পতির 'উ' চিহ্নিত উপগ্রহটির একটা গ্রহণ হইল। এই গ্রহণের খবর পৃথিবীবাসীকে জানাইবে কে? আলোই 'উ' চিহ্নিত উপগ্রহ হইতে ছুটিয়া আসিয়া পৃথিবীবাসীকে গ্রহণের খবর জানাইয়া দিবে। ইহাতে আলো'কে 'উ' চিহ্নিত জায়গা হইতে ডাইনের 'পৃ' চিহ্নিত জায়গা পর্য্যন্ত পথটা চলিতে হইবে। আবার মনে কর, পৃথিবী যখন বামদিকে 'পৃ' চিহ্নিত জায়গায় আসিয়া বৃহস্পতি হইতে খুব দূরবর্ত্তী হইয়াছে, তখন যেন সেই উপগ্রহেরই আর একটা গ্রহণ হইল। এই গ্রহণেব খবর বহিয়া আনিতে আলো'কে 'উ' চিহ্নিত জায়গা হইতে বামদিকের 'পৃ' চিহ্নিত জায়গা পর্য্যন্ত ছুটিতে হইবে। আলোর রশ্মি এই যে দুইটি পথ চলিয়া পৃথিবীতে গ্রহণের খবর দিল, তাহার মধ্যে কোন্‌টি বড় বলা যায় না কি? দ্বিতীয় পথটি বড় এবং প্রথম পথটি ছোটো। কাজেই, প্রথম গ্রহণের খবর পৃথিবীতে পেঁাছিতে যে সময় লাগিবে. দ্বিতীয়ের আসিতে তাহার চেয়ে বেশী সময়ের দরকার হইবে। জ্যোতিষীরা অনেকবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন, সময়ের এই পার্থক্যটা নিতান্ত অল্প নয়,—পরিমাণে ইহা আর ষোল মিনিট। তাহা হইলে বলিতে হয়, ছবির প্রথম 'পৃ' চিহ্নিত জায়গা হইতে দ্বিতীয় 'পৃ' চিহ্নে আসিতে আলো ষোল মিনিট সময় লয়। কিন্তু এই দুই চিহ্নের ব্যবধান আমাদের জানা আছে। ইহা প্রায় আঠারো কোটী মাইলের সমান। সুতরাং যে-আলো ষোল মিনিটে আঠারো কোটী মাইল যায়, তাহা এক সেকেণ্ডে কত মাইল যাইবে, এই

ত্রৈরাশিকের সহজ অঙ্কখানা কষিলে আলোর বেগ বাহির হইয়া পড়ে। এই হিসাবে আলোর বেগ হইয়া দাঁড়ায় সেকেণ্ডে এক লক্ষ সাতাশী হাজার মাইল। অর্থাৎ মোটামুটি প্রায় এক লক্ষ নব্বুই হাজার মাইল।

দেখ, বৈজ্ঞানিকেরা গ্রহ-নক্ষত্র দেখিয়া কেমন সহজে আলোর বেগ স্থির করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ফিজো নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত এত হাঙ্গামা না করিয়া এই পৃথিবীর উপরেই আলোর যাতায়াত পরীক্ষা করিয়া তাহার বেগ স্থির করিয়াছিলেন। সে-কথা তোমাদিগকে এখন বলিব না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ফিজোর হিসাবের সহিত পূর্ব্বের হিসাবের অবিকল মিল দেখা গিয়াছে। কাজেই বলিতে হয়, আলো যে সেকেণ্ডে এক লক্ষ সাতাশী হাজার মাইল বেগে চলে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আলোর প্রতিফলন

মাটিতে জোরে রবারের বল্ ফেলিলে তাহা সেখান হইতে ঠিক্‌রাইয়া হাতে আসে। এই রকমে দেওয়ালের গায়ে রবারের বল্ ছুড়িয়া আমরা ছেলেবেলায় অনেক লোফালুফি খেলা করিয়াছি। তোমরাও বোধ হয় করিয়াছ। মাটিতে টের্‌চাভাবে বল্ ফেলিবে তাহা মাটি হইতে ঠিক্‌রাইয়া টের্‌চাভাবে উল্‌টা দিকে যায়; তাহা তখন হাতে আসে না। টেনিস্ খেলার সময়ে তোমরা হয় ত ইহা দেখিয়াছ। বিলিয়ার্ড, ক্যারম প্রভৃতি বিলাতি খেলাতেও ইহা দেখা যায়। খেলোয়াড় এমন ভাবে বাঁকাইয়া বল্‌গুলিকে মারে যে, সেগুলি ঠিক্‌রাইয়া ইচ্ছামত জায়গায় হাজির হয়। একটু অভ্যাস করিলেই এই সব খেলা করা যায়। তোমরা মার্বেল খেলার সময়েও এই রকম হিসাব করিয়া খেলা করিয়া থাকো। কেবল রবারের বল্ এবং মার্বেল নয়, যখন আলোর রশ্মি আয়না বা আয়নার মতো চক্‌চকে কোনো জিনিষের উপরে পড়ে, তখন তাহাও ঠিক্‌রাইয়া যায়। ইহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। আমরা ছেলেবেলায় একখানা ছোটো আয়না হাতে পাইলেই, সেখানি লইয়া রৌদ্রে বসিতাম এবং তাহার উপরে যে-রৌদ্র পড়িত তাহাকে ঘরের ভিতরে দেওয়ালের গায়ে ফেলিতাম। রবারের বল্ যেমন ছিট্‌কাইয়া চলে, তেমনি বাহিরের রৌদ্র চক্‌চকে আয়নার উপরে ঠিক্‌রাইয়া ঘরের ভিতরে

যাইত। তোমরাও হয় ত আয়না লইয়া এই রকম খেলা করিয়াছ। কেবল খেলা নয়, আয়নার উপরে আলো ফেলিয়া সঙ্কেতে দূরে খবরাখবর দেওয়াও চলে। আগে যুদ্ধের সময়ে এই রকমে আয়নার আলো দূরে পাঠাইয়া সেখানকার সৈন্যদের কাছে সঙ্কেতে খবর দেওয়া হইত। যাহা হউক, রবারের বল, মার্বেল এবং আলো প্রভৃতির ঐরকমে ঠিক্‌রাইয়া চলাকে প্রতিফলন (Reflection) বলে।

এই জগতে কোনো কাজই অনিয়মে হয় না। চন্দ্র সূর্য্যের চলাফেরা গ্রহ-নক্ষত্রের উদয়াস্ত সবই নিয়ম মানিয়া চলে। তুমি খেলার যে-বল্‌টিকে আকাশের দিকে ছুঁড়িলে তাহাও একটা নিয়ম মানিয়া উপরে উঠে এবং নীচে নামে। এই সব নিয়মের অন্যথা করার সাধ্য কাহারো নাই। একটা বল্‌কে তোমরা যখন মাটিতে ফেল এবং আয়নার উপরে সূর্য্যের আলো ফেলিয়া যখন ঘরের ভিতরে লইয়া যাও, তখনো সেগুলি একটা নিয়ম মানিয়া চলে। তোমরা বোধ হয়, এই নিয়মটি জানো না। এখন তোমাদিগকে তাহারি কথা বলিব।

পরপৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। মনে কর, তুমি যেন একটা টেনিস্ বল্‌কে মাটিতে টের্‌চাভাবে ফেলিলে তাহা ছবির 'ক খ' পথে চলিয়া 'খ' জায়গাতে মাটিতে ঠেকিল এবং লাফাইল। এখন তাহা কোন্ পথে ঠিক্‌রাইয়া চলিবে তোমরা বলিতে পার কি? তোমরা বল্ লইয়া অনেক খেলা করিয়াছ। টের্‌চাভাবে বল্ ফেলিলে তাহা লাফাইয়া তোমার হাতে ফিরিয়া আসিল, ইহা

দেখিয়াছ কি? নিশ্চয়ই দেখ নাই। বল্‌টাকে যদি মাটিতে লম্বভাবে ফেলা যায় তবেই তাহা হাতে ফিরিয়া আসে,—একটু বাঁকা করিয়া ফেলিলে তাহা লাফাইয়া তোমার বিপরীত দিকে দূরে চলিয়া যায়। কাজেই "ক খ" পথে যে বল্‌টি মাটিতে পড়িল, তাহা লাফাইয়া "খ গ" পথে চলিবে। তোমরা হয় ত বলিবে, এই লাফাইয়া চলার মধ্যে আবার নিয়ম কোথায়? বাঁকা করিয়া বল্ ছুঁড়িলে তাহা লাফাইয়া বাঁকা পথে চলে, ইহা
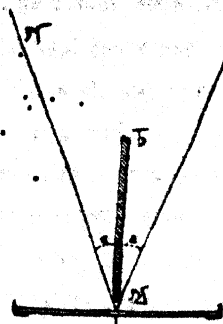
ত জানা কথা। কিন্তু ইহার মধ্যেও সুন্দর নিয়ম আছে। সেই নিয়মকে অতিক্রম করিয়া বল্ কখনই ছিট্‌কাইয়া চলে না। দেখ, ছবিতে 'খ চ' নামে একটা রেখা টানা আছে। ইহা একটা লম্ব রেখা অর্থাৎ ইহা মাটির সঙ্গে ঠিক্ সমকোণ করিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। এখন যদি তোমরা 'ক খ চ' এবং 'গ খ চ' এই দুই কোণকে মাপিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, উহারা পরস্পর সমান। বিজ্ঞানের ভাষায় এই দুই কোণের বিশেষ নাম আছে।

সাধারণতঃ 'ক খ চ' কোণকে প্রক্ষেপ-কোণ (Angle of Incidence) এবং 'গ খ চ' কোণকে প্রতিফলন-কোণ (Angle of Reflection) বলা হয়। তোমরা যে-ভাবেই মাটিতে বল্ ফেল না কেন সকল সময়েই এই দুই কোণকে পরস্পর সমান দেখিতে পাইবে।

তাহা হইলে দেখা গেল, মাটিতে বা দেওয়ালের গায়ে বল্ ফেলিলে তাহা একটা নিয়ম মানিয়া লাফায়; তাহার প্রক্ষেপ এবং প্রতিফলন-কোণ সকল সময়েই সমান থাকে। কেবল যে রবারের বল্ই এই নিয়ম মানিয়া চলে, তাহা নয়। যাহা লাফায়, যাহা কোনো জিনিষে আঘাত পাইয়া ঠিক্রাইয়া চলে, তাহাদের সকলকেই এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। তা ছাড়া যখন আয়না বা অন্য কোনো চক্চকে জিনিষের উপরে আলো পড়ে, তখন তাহাও ঐ নিয়মে প্রতিফলিত হয়। মনে কর, পূর্ব্বের ছবিখানিতে যেন একখানা আয়না পাতা আছে এবং তাহার উপরে যেন 'ক খ' রেখার মতো একটা আলোর রশ্মি পড়িতেছে। ইহাতে দেখিবে, আলোর রশ্মি 'খ' বিন্দুতে আয়নায় ঠেকিয়া 'খ গ' পথে বাঁকিয়া চলিতেছে। এখানেও প্রক্ষেপ-কোণ প্রতিফলন-কোণের সঙ্গে সমান হইল। আর এক কথায় বলা যাইতে পারে, আলোর রশ্মি যতটা হেলিয়া আয়নায় পড়ে, প্রতিফলনের পরে তাহা বিপরীত দিকে ঠিক্ ততটা হেলিয়া উপরে উঠে।

দেওয়ালের গায়ে বা মাটিতে বল্ ফেলিলে তাহা প্রতিফলিত হইয়া লাফায়। কিন্তু যত জোরে তুমি বল্টিকে ফেলিবে তাহা

কি ঠিক্ তত জোরেই লাফাইয়া চলে ? কখনই নয়। দেওয়ালে এবং মাটিতে আঘাত পাইলে তাহার শক্তি কমিয়া যায় তাই প্রতিফলিত হইয়া তাহা কম জোরে চলে। আলো সম্বন্ধেও ঠিক্ এই কথাই বলা যায়। যে আলো আয়না বা অন্য কোনো চক্‌চকে জিনিষের উপরে পড়ে, তাহার সবটাই ঠিক্‌রাইয়া প্রতি-ফলিত হয় না। যে-জিনিষের উপরে পড়ে, তাহা কতকটা আলো চুষিয়া নষ্ট করে। তা'র পরে কেবল বাকিটাই প্রতিফলিত হয়। আবার দেখ, সব জিনিষের প্রতিফলন-শক্তি সমান নয়। একখানি কাচ হইতে যতটা আলো প্রতিফলিত হয়, পারালাগানো কাচে অর্থাৎ আয়নায় তাহার চেয়ে অনেক বেশী আলো প্রতিফলিত হইয়া আসে। এক বালতি জলকে ঘরের বাহিরে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে, ইহা হইতে যে-পরিমাণ রৌদ্র প্রতিফলিত হইয়া ঘরের ভিতরে আসিতেছে, বেশ পালিশ-করা চক্‌চকে কাঁসার থালায় রৌদ্র ফেলিলে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি রৌদ্র ঘরে আসে। কেন এমন হয় ? জলে রৌদ্র পড়িলে তাহার অধিকাংশই জল চুষিয়া নষ্ট করে কিন্তু কাঁসার থালা তাহা করে না। ইহাতেই প্রতিফলিত আলোর কম-বেশী দেখা যায়। কিসে সকলের চেয়ে বেশী আলো প্রতিফলিত হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। খুব পালিশ-করা ধাতু হইতেই বেশী আলো ঠিক্‌রাইয়া আসে। আবার ধাতুর মধ্যে পারাই বেশী আলো প্রতিফলিত করে। আয়না হইতে আলোর যে প্রতিফলিত হয়, তাহাকে হয় ত তোমরা কাচেরই প্রতিফলন মনে কর। কিন্তু তাহা নয়। আয়নার

কাচের তলায় যে পারা লাগানো থাকে তাহা তোমরা নিশ্চয় দেখিয়াছ। ইহা কেবল পারা নয়, পারার সঙ্গে রাঙও একটু মিশানো থাকে। ইহাই আলো প্রতিফলিত করে। আয়নার কাচের তলাকার পারা উঠাইয়া পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে, এখন আয়না হইতে আর আগেকার মতো আলো প্রতিফলিত হইতেছে না।

ছড়ানো আলো

ভোরে সূর্য্য উঠিয়াছে। আমরা সূর্য্যকে আকাশের নীচে প্রকাণ্ড থালার আকারে দেখিতে পাইলাম। ঘর-দুয়ার, মাঠ-ঘাট আলোতে পূর্ণ হইয়া গেল। সন্ধ্যাবেলায় পূজার ঘরে প্রদীপ জ্বলিল। প্রদীপের শিখা দেখিতে পাইলাম ; ঘর আলোতে ভরিয়া গেল। সূর্য্য, প্রদীপের শিখা ইত্যাদি উজ্জ্বল জিনিষকে আমরা কেন দেখিতে পাই, তাহা বলা কঠিন নয়। উজ্জ্বল জিনিষ হইতে আলো আসিয়া আমাদের চোখে পড়ে, ইহাতে সেগুলিকে দেখা যায়। কিন্তু বাড়ির আঙিনায় যে ফুলের গাছটি দাঁড়াইয়া আছে, মাঠে যে গরুগুলি চরিয়া বেড়াইতেছে, আল্‌নায় যে কাপড়গুলি শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে,—এই রকম যে শত শত জিনিষ সর্ব্বদাই আমাদের নজরে পড়ে, সেগুলি ত সূর্য্যের মতো বা প্রদীপের শিখার মতো উজ্জ্বল নয়। তবে আমরা কেন সেগুলিকে দেখিতে পাই? আবার দেখ, ঘর অন্ধকার, ঘরের কোথায় টেবিল, কোথায় চেয়ার এবং কোথায় বই আছে, কিছুই দেখা যাইতেছে না। এমন কি, নিজের হাত-পাও অন্ধকারে চেনা যাইতেছে না। কিন্তু যেই দেশলাই জ্বালিলে অমনি ঘরের খুঁটিনাটি সব জিনিষই নজরে পড়িয়া গেল। কেন এমন হয়, তোমরা বলিতে পার কি? আমরা যখন প্রথমে বিজ্ঞানের বই পড়িতাম, তখন এই সব কথা বার বার মনে হইত। তোমাদের

মনেও বোধ হবি এই সব প্রশ্ন উদয় হয়, তাই বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

আলোর প্রতিফলন সম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। তাহা হইতে তোমরা হয়ত বুঝিয়াছ, আয়না জল বা পালিশ-করা চক্‌চকে জিনিষের উপরে যখন আলো পড়ে, তখনি বুঝি সেগুলি হইতে আলো প্রতিফলিত হয়,—অন্য জিনিষে আলোর প্রতিফলন নাই। কিন্তু তাহা নয়। প্রায় সব জিনিষই কম-বেশি আলো প্রতিফলিত করিতে পারে। তফাতের মধ্যে এই যে, আয়নার মতো চক্‌চকে সমতল জিনিষে যে-সকল আলোর রশ্মি পড়ে সেগুলির প্রায় সকলি প্রতিফলনের পর একদিক্‌ ধরিয়া চলে, অন্য জিনিষে যে-আলো পড়ে তাহা সে-রকমে প্রতিফলিত হয় না এবং সে-রকমে চলে না। কথাটা বোধ হয় বুঝিতে পারিলে না। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝানো যাউক। মনে কর, ভোর বেলায় তোমাদের বাগানের রাস্তার উপরে সূর্য্যের আলো পড়িয়াছে। এই আলো কোথায় যায়, তোমরা বলিতে পার কি? ইহার কতকটা রাস্তার মাটি ও কাঁকর চুষিয়া নষ্ট করে এবং বাকিটা প্রতিফলিত হয়। কিন্তু জায়গাটা আয়নার মতো চক্‌চকে এবং সমতল নয়। কাজেই, সূর্য্যের আলো আয়নায় প্রতিফলিত হইয়া যেমন একদিকে ছুটিয়া চলিত, বালির কণা, মাটি কাঁকর প্রভৃতিতে ঠিক্‌রাইয়া সে-রকমে চলে না,—তাহার কতক উপর দিকে, কতক আশে-পাশে ঠিক্‌রাইয়া চলিতে আরম্ভ করে।

পর পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। দেখ, কতকগুলি আলোর
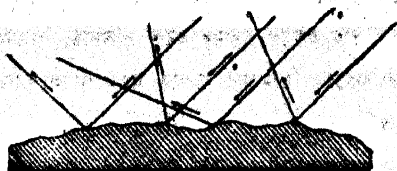
রশ্মি একটা অসমান জায়গায় পড়িয়া কত এলোমেলোভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। ডাইনে-বাঁয়ে, পূর্ব্বে-পশ্চিমে, উত্তরে-

দক্ষিণে সব দিকে সেই আলো প্রতিফলিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই প্রতিফলিত ছড়ানো আলোর রশ্মিই আমাদের দৃষ্টির সহায় হয়। ইহার কতকগুলি রশ্মি যখন তোমার চোখে পড়ে, তখন তুমি জায়গাটিকে দেখিতে পাও, আমার চোখে পড়িলে আমি দেখিতে পাই। তাহা হইলে বলিতে হয়, কোনো জিনিষকে দেখার কাজটা কেবল প্রতিফলিত ছড়ানো আঁলোতেই (Diffused Light) হয়। তুমি যখন প্রদীপের কাছে বই রাখিয়া পড়িতে থাকো, তখন প্রদীপের আলো প্রথমে বইয়ের পাতায় পড়ে। তার পরে কতক অংশ চুষিয়া লওয়ার পরে যাহা বাকি থাকে তাহারি কয়েকটা রশ্মি অনিয়মিতভাবে প্রতিফলিত হইয়া যখন তোমার চোখে আসিয়া হাজির হয়, তখন তুমি তাহাতেই বইয়ের পাতা দেখিতে পাও এবং বইয়ের অক্ষর চিনিতে পার। দিনের বেলায় যখন পড়িবার ঘরে বসিয়া বসিয়া তোমরা পড়া তৈয়ারী কর, তখনো ইহাই ঘটে। সূর্য্যের আলো বাহিরের নানা জিনিষে অনিয়মিতভাবে প্রতিফলিত হইয়া ঘরের ভিতরে আসে এবং তোমার

বইয়ের পাতার উপরে পড়ে। তার পরে এই ছড়ানো আলো পাতা হইতে প্রতিফলিত হইয়া যখন তোমাদের চোখে আসিয়া ঠেকে তখন তোমরা বই দেখিতে পাও। দূরে যে-বাঁশঝাড়ের সারি দেখিতে পাইতেছ, তাহার দেখার কাজও প্রতিফলিত ছড়ানো আলোতে হয়। বাঁশের ডালপালা ও পাতায় সূর্য্যের আলো পড়ে। তার পরে সেই আলোই প্রতিফলিত হইয়া তোমাদের চোখে আসিয়া হাজির হয়। কাজেই তোমরা গাছগুলিকে দেখিতে পাও।

তোমরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, বাদলের দিনে যখন মেঘে সূর্য্য ঢাকা থাকে, তখন আমরা আলো পাই কেন? ইহাও ছড়ানো আলোর কাজ। সূর্য্যের আলো মেঘে মেঘে অনিয়মিত ভাবে ঠিক্‌রাইয়া পৃথিবীর উপরে ছড়াইয়া পড়ে। তার পরে সেই ছড়ানো আলো যখন নানা জিনিষ হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে আসে, তখনি আমরা চারিদিকের জিনিষকে দেখিতে পাই।

সূর্য্যের উদয় হইবার অনেক আগে রাত্রির অন্ধকার ছুটিয়া যায়; তখন চারিদিকে একটু একটু আলো হয়। উষা-কালের এই আলো কোথা হইতে আসে, এখন বোধ হয় তোমরা নিজেরাই বলিতে পারিবে। তখন সূর্য্য পৃথিবীর আড়ালে থাকে, কিন্তু তাহার আলো আকাশের উপরে চলা-ফেরা করে। তার পরে সেই আলো যখন মেঘে ও বাতাসের ভিতরকার ধূলিকণায় প্রতি-ফলিত হইয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে, তখনি আমরা সেই ছড়ানো

আলোতে চারিদিকের জিনিষপত্র দেখিতে পাই। গোধূলি আলো কেমন সুন্দর তাহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। সূর্য্য অস্ত যাওয়ার অনেক পরেও তাহা থাকে। ইহাও সূর্য্যের প্রতিফলিত আলো। মেঘে মেঘে এবং আকাশের ধূলিকণায় ঠিক্‌রাইয়া উহা পৃথিবীতে নামে। তোমরা লক্ষ্য করিয়ো, দেখিবে, যে-দিন আকাশে বেশি মেঘ থাকে সে-দিন গোধূলির আলো বেশি স্থায়ী হয়। সূর্য্যের আলো মেঘে ঠেকিয়া ঠিক্‌রাইতে পায় বলিয়াই ইহা ঘটে।

অন্ধকার ঘরের কোনো জিনিষকে দেখা যায় না। কিন্তু যেই আলো জ্বালা যায়, অমনি সকলি নজরে পড়ে। ইহা কেন হয়, এখন তোমরা বুঝিতে পারিবে। অন্ধকার ঘরে আলো থাকে না, তাই ঘরের কোনো জিনিষই আলো প্রতিফলিত করিতে পারে না। এই জন্তই তখন কোনো জিনিষ আমাদের নজরে পড়ে না। তা'র পরে যেই আলো জ্বালা যায় অমনি তাহা ঘরের সব জিনিষে কম-বেশি প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে পড়ে। ইহাতেই আমরা তখন সব জিনিষকে দেখিতে পাই। তোমরা হয় ত লক্ষ্য করিয়াছ, সাদা চুণকাম-করা ঘরে আলো জ্বালিলে ঘরে যতটা আলোকিত হয়, আল্‌কাতরা-মাখানো বা কালো রঙ-করা ঘরে ততটা আলো খোলে না। কেন ইহা ঘটে, তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে। কালোর চেয়ে সাদা জিনিষই বেশি আলো প্রতিফলিত করিতে পারে। তাই সাদা দেওয়ালে প্রদীপের আলো বার বার প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত ঘরে ছড়াইয়া পড়ে, ইহাতেই সাদা চুণকাম-করা ঘর আলোকিত হয়। আল্‌কাতরা-লাগানো

কালো দেওয়ালে কিন্তু তাহা হয় না। সেখানে প্রদীপের, যে আলো দেওয়ালে পড়ে, তাহার অধিকাংশই দেওয়ালে চুষিয়া নষ্ট করে। কাজেই, বেশি আলো প্রতিফলিত হইতে পারে না। ইহাতেই গোবর-মাটি বা আল্‌কাতরা-লেপা ঘরে আলো খোলে না। চৈত্র-বৈশাখ মাসের রৌদ্রে ঘরের সম্মুখে সাদা কাপড় শুকাইতে দিলে কি হয় তোমরা দেখ নাই কি? সেই কাপড়ে রৌদ্র অনিয়মিত ভাবে প্রতিফলিত হইয়া ঘরে আসে, ইহাতে ঘরের আলো বাড়িয়া যায় এবং কাপড়ের দিকে তাকাইলে চোখ টন্ টন্ করে। কিন্তু একখানি নীলাম্বরী সাড়ি সেই জায়গায় মেলা থাকিলে, আলো সে-রকমে বেশি ছড়ায় না এবং ঘরেও আলো আসে না। সুতরাং বলিতে হয়, সাদা কাপড় যত বেশি আলো প্রতিফলিত করিতে পারে, কালো কাপড়ে তত আলো প্রতিফলিত হয় না। অর্থাৎ জিনিষের রঙেও আলোর প্রতিফলন কম-বেশি হয়। এসম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদিগকে পরে বলিব।

প্রতিফলিত আলোর দিক

সূর্য্যের দিকে তাকাইলে তাহার আলো চোখে আসিয়া পড়ে এবং যে দিক হইতে আলো আসিয়া চোখে পড়িতেছে, আমরা সূর্য্যকে সেই দিকে দেখিতে পাই। প্রদীপ বা অন্য কোনো উজ্জ্বল আলোতেই তাহা হয়। যে-দিক্ হইতে আলো চোখে আসিয়া পড়ে, আমরা জিনিষগুলাকে সেই দিকে দেখিতে পাই। প্রতিফলিত আলোতেও তাহাই হয় না কি? মনে করা যাউক, তুমি যেন ঘরের ভিতরে ছায়ায় বসিয়া আছ এবং আর একজন আয়না লইয়া বাহিরের রৌদ্র তোমার চোখে ফেলিতেছে। সূর্য্যের রশ্মি আয়নায় প্রতিফলিত হইয়া বাঁকিয়া তোমার চোখে পড়িল। এখন তুমি আয়নার দিকে তাকাইলে কি দেখিতে পাইবে? কেবল আলো দেখিবে না, আয়নার পিছনে সূর্য্যকেও দেখিতে পাইবে। তাহা হইলে দেখ, সূর্য্যের আলোর যে-সব রশ্মি আয়নায় প্রতিফলিত হইয়া তোমার চোখে পড়িল, সেগুলি যে-পথে চোখে আসিয়া পড়িতেছে, সেই পথেরই পিছনে সূর্য্যকে দেখা গেল।

পর পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। মনে কর, একখানা আয়নার উপরে আলোর কতকগুলি রশ্মি "ক খ" রেখায় আসিয়াছে এবং পরে "গ খ" রেখায় প্রতিফলিত হইয়া সেইগুলিই তোমার চোখে পড়িতেছে। এখন যদি তুমি আয়নার দিকে তাকাও তাহা হইলে

"খ গ" রেখার দিকে "ঘ" জায়গায় আর একটা আলোকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে। এক বাল্‌তি জলকে রৌদ্রে রাখিয়া পরীক্ষা করিলেও ইহা দেখা যায়। সূর্য্যের আলো জলে প্রতিফলিত হওয়া চোখে পড়িলে যে-পথে আলো চোখে পড়ে তাহারি নীচের
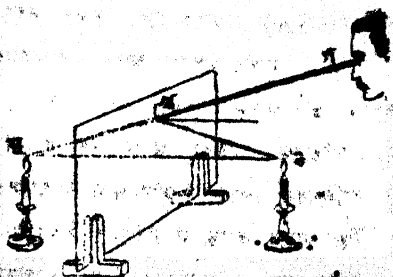
দিকে জলের মধ্যে সূর্য্যকে দেখা যায়। আয়নার সম্মুখে যে-কোনো আলো জ্বালাইয়া রাখিলেও ইহা ঘটে। আলো যে-পথে প্রতিফলিত হইয়া চোখে আসে, তাহার প্রতিবিম্ব সেই পথেরই পিছন দিকে থাকে।

তোমরা এই সকল ব্যাপার প্রতিদিনই দেখিতে পাও না কি? তবুও এই সহজ পরীক্ষাগুলি তোমরা নিজে নিজে করিয়া দেখিয়ো। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিবে, আসল উজ্জ্বল জিনিষটা যেখানেই থাকুক, যে-পথে তাহার আলো চোখে আসিয়া পড়ে, জিনিষটাকে সেই পথেরই পিছনে দেখা যায়। এই কথাটি তোমরা বিশেষ করিয়া মনে রাখিয়ো। পরে আলো সম্বন্ধে অনেক ব্যাপারে ইহার প্রয়োগ দেখা যাইবে।

প্রতিবিম্ব

প্রতিবিম্ব (Image) কাহাকে বলে, তোমরা সকলেই বোধ করি তাহা জানো। মুখের সম্মুখে আয়না রাখিলেই তোমার মুখের একখানি ছবি আয়নার পিছনে দেখা যায়। এই ছবিই তোমার মুখের প্রতিবিম্ব। কেবল আয়নাতেই যে প্রতিবিম্ব হয়, তাহা নয়। পালিশকরা চক্‌চকে কাঁসার থালা বা গ্লাসেও প্রতিবিম্ব দেখা যায় ; স্থির জলের কাছে দাঁড়াইলেও সর্ব্বাঙ্গের প্রতিবিম্ব জলের নীচে নজরে পড়ে। তোমাদের খালের বা পুষ্করিণীর জলে চারিদিকের গাছপালার কেমন সুন্দর প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহা তোমরা লক্ষ্য কর নাই কি? "কথামালা"র দুষ্ট কুকুর এক টুক্‌রা মাংস মুখে করিয়া নদী পার হইতে গিয়াছিল। ইহাতে তাহার কি বিপদ হইয়াছিল, তাহা বোধ করি তোমাদের মনে আছে। নদীর জলের নীচে নিজের প্রতিবিম্বকে অন্য কুকুর মনে করিয়া হাঁ করিবামাত্র তাহার মুখের মাংস জলে পড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। দেখ, কুকুরটা কেমন জব্দ হইয়াছিল। আমাদের বাড়ীতে একখানা বড় আয়না ছিল। চড়াই পাখীরা তাহার সম্মুখে বসিয়া নিজেদের প্রতিবিম্বকে অন্য পাখী মনে করিয়া আয়নায় ঠোকর মারিত। ঠোঁট দিয়া রক্ত বাহির হইলেও প্রতিবিম্বের সঙ্গে লড়াই করিতে ছাড়িত না। পর পৃষ্ঠায় একটা ছোটো খালের ধারের

গাছপালার ছবি দিলাম। দেখ, খালের জলের নীচে গাছপালার কেমন সুন্দর প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

যাহা হউক, আয়নার সম্মুখে কোনো জিনিষ রাখিলে কেমন করিয়া তাহার প্রতিবিম্ব পিছনে দেখা যায়, সেই কথাটা এখন

তোমাদিগকে বলিব। ৬৩ পৃষ্ঠায় যে আয়না ও বাতির ছবি দিয়াছি সেখানি দেখ। একখানি আয়নার সম্মুখে একটা মোম বাতি জ্বলিতেছে এবং পিছনে বাতির যে প্রতিবিম্ব পড়িতেছে, তাহা একটা লোক দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। কি-রকমে বাতির প্রতিবিম্ব পিছনে দেখা যায় আলোচনা করা যাউক্। বাতির উজ্জ্বল শিখা হইতে অনেক আলোর রশ্মি বাহির হইয়া সব দিকে ছুটিয়া চলিতেছে; আবার কতক আয়নায় পড়িয়া প্রতিফলিত হইতেছে। কিন্তু প্রতিফলিত আলোর সব রশ্মি লোকটার চোখে আসিতেছে না। কতক মাথার উপর দিয়া, কতক ঘাড়ে বুকে বা

আশে-পাশে চলিয়া নষ্ট হইতেছে। সেগুলি কোনো কাজেই লাগিতেছে না। কেবল যে-কয়েকটি রশ্মি প্রতিফলনের পরে চোখে আসিয়া পড়িতেছে, তাহাতেই লোকটা বাতির প্রতিবিম্ব দেখিতেছে। কোন্ ধারে দেখিতেছে? তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, কোনো উজ্জ্বল জিনিষের আলো যে-পথে আসিয়া চোখে পড়ে সেই পথেরই পিছনে জিনিষটাকে দেখা যায়। ছবির "কখ" রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া "খগ" পথে চোখে আসিতেছে। কাজেই ঐ পথকে পিছনে বাড়াইলে যে রেখা পাওয়া যায়, তাহারি উপরে "ঘ" জায়গায় বাতির শিখার প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, কেবল উজ্জ্বল জিনিষেরই বুঝি এই রকম প্রতিবিম্ব হয়। কিন্তু তাহা নয়। উজ্জ্বল অনুজ্জ্বল সাদা রাঙা সব জিনিষেরই প্রতিবিম্ব ঠিক্ এই রকমেই হইতে দেখা যায়।

এখন ৬৭ পৃষ্ঠার ছবিখানির দিকে নজর কর। দেখ, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন লোক নিজের মুখ দেখিতেছে। সূর্য্য হইতে বা প্রদীপের শিখা হইতে যেমন আলোর রশ্মি বাহির হয়, মুখ হইতে সে-রকম রশ্মি বাহির হয় না বটে, কিন্তু প্রতিফলিত আলোর অভাব কোনো জায়গাতেই নাই। দিনের বেলায় সূর্য্যের আলো এবং রাত্রিতে চাঁদের, নক্ষত্রের বা প্রদীপের আলো নানা জিনিষে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে পড়ে, ইহাতে আমরা সে-সব জিনিষকে দেখিতে পাই। কাজেই ছবিতে আঁকা লোকটার

মুখ উজ্জ্বল না হইলেও তাহাতে যে বাহিরের নানা প্রতিফলিত আলো আসিয়া পড়িতেছে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। এই আলোর রশ্মিই মুখ হইতে ঠিক্‌রাইয়া আয়নায় পড়ে এবং তাহাতেই লোকটা আয়নার পিছনে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে। প্রতিফলিত আলো মুখ হইতে বাহির হইয়া কি-রকমে পথে চলে এবং আয়নায়
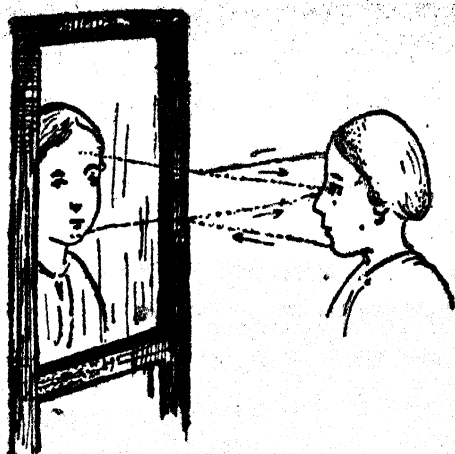
কি-রকমে প্রতিফলিত হয়, ছবিতে তাহা আঁকিয়া দিলাম। দেখ, লোকটার কপাল হইতে আলোর রশ্মি বাহির হইয়া আয়নায় প্রতিফলিত হইয়াছে এবং পরে তাহাই চোখে আসিয়া পড়িতেছে॥ কাজেই, সে নিজের কপালের ছবি, ঐ রশ্মি-পথের পিছনে দেখিতেছে। আবার থুথ্‌নির গোড়াকার রশ্মিগুলি দ্বারা কি হইতেছে দেখ। সেখানকার রশ্মি প্রতিফলিত হওয়ার পরে

লোকটার চোখে পড়িতেছে। কাজেই থুথ্‌নির ছবিও সে আয়নার পিছনে দেখিতেছে। এই রকমে মুখের সকল অংশের আলো প্রতিফলিত হইয়া চোখে পড়ায় সে তাহার নিজের মুখের একটি সুন্দর ছবি আয়নার পিছনে দেখিতে পায়।

তোমরা মনে রাখিয়ো, এই রকমে সাধারণ সমতল আয়নায় আমরা যে-প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই, তাহার কোনো অস্তিত্বই নাই। এই প্রতিবিম্ব হয় আয়নার পিছনে। সম্মুখের আলোর রশ্মি আয়না ভেদ করিয়া পিছনে যায় কি? কখনই যায় না। কিন্তু তবুও আমরা একটা প্রতিবিম্ব দেখি। ইহাকে ধরিয়া ছুঁইয়া পাওয়া যায় না, পিছনে সাদা কাগজ ধরিলে কাগজের উপরেও সে-ছবি পড়ে না। সুতরাং বলিতে হয়, আমরা আয়নায় যে-প্রতিবিম্ব দেখি তাহা সত্য নয়। ইহা মিথ্যা প্রতিবিম্ব দৃষ্টি-বিভ্রম বা মায়া-ছবি (Virtual Image) ছাড়া আর কিছুই নয়। রাবণ মায়া-মৃগ সাজিয়া সীতাদেবীকে ভুলাইয়াছিল। এ যেন তাহারি মতো একটা কিছু; ইহাকে ধরিয়া ছুঁইয়া নাড়াচাড়া করা যায় না। কিন্তু কাচের পরকলার ভিতর দিয়া আলোর রশ্মি আসিলে ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার ভিতরে যে ছোটো প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় সেগুলি সত্য ছবি (Real Image)। সেগুলিকে কাগজের উপরে ফেলা যায়। এই সম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদিগকে পরে বলিব।

ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়না

ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়না তোমরা দেখ নাই কি ? কেরোসিন বাতির পিছনে যে চক্‌চকে ধাতুর প্রতিফলক থাকে, তাহাকে ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়না বলা যাইতে পারে। কড়াইয়ের খোলের দিক্‌টার আকৃতি যে রকম, ইহা যেন কতকটা সেই রকমেরই। পিছনে পারা-দেওয়া কাচের ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়না আজকাল বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। এই আয়নাকে খুব কাছে আনিয়া মুখ দেখিলে, মুখগুলিকে খুব বড় দেখায়। তোমরা ইহা দেখ নাই কি ? কাছে পাইলে এই রকম আয়নাকে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়ো।

যাহা হউক, ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়নায় (Concave mirror) কি-রকমে বাহিরের জিনিষের প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা তোমাদিগকে এখন বলিব। কোন চক্‌চকে জিনিষের উপরে আলোর রশ্মি টের্‌চাভাবে পড়িলে তাহা প্রতিফলিত হয় এবং প্রতিফলনের সময়ে তাহার প্রক্ষেপ-কোণ প্রতিফলন-কোণের সঙ্গে সমান হয়, ইহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়নায় যে আলো পড়ে, তাহার প্রতিফলনেও ঠিক্ ঐ নিয়মই দেখা যায়। প্রাকৃতিক নিয়ম এক জায়গায় এক রকম এবং অন্য জায়গায় অন্য রকম ইহা কখনই ঘটে না। পরপৃষ্ঠায় একটা ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়নার ছবি আঁকিয়া দিলাম। "ক" যেন আয়নার বাঁকা অংশের কেন্দ্র। মনে কর "চ ট" এবং "ত প" এই দুই পথে যেন কতকগুলি

আলোর রশ্মি "ট" ও "ত" বিন্দুতে আয়নায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। খুব দূরের জিনিষ হইতে বা সূর্য্য হইতে আসিয়া যে-সকল রশ্মি পৃথিবীতে পড়ে, সেগুলিকে সাধারণতঃ সমান্তরাল রশ্মি ধরা হয়। ইহাতে হিসাবের বিশেষ কোনো গোল-যোগ হয় না। মনে কর "চ ট" ও "প ত" রশ্মি যেন সূর্য্যের রশ্মির মতো সমান্তরাল। কেবল ইহাই নয়। মনে কর, ঐ রশ্মিগুলি যেন আয়নার মধ্যরেখা (Principal Axis) "খ ক"-এর সঙ্গে সমান্তরাল হইয়া আছে।
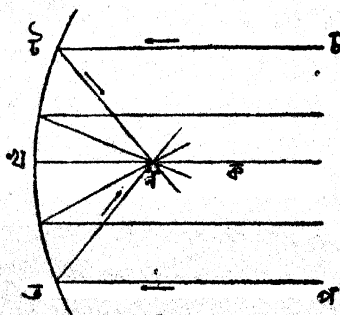
এখন দেখা যাউক, ঐ "চ ট" ও "প ত" রশ্মিগুলি আয়নায় প্রতিফলিত হইয়া কোন্ দিকে চলে। তোমরা আগেই দেখিয়াছ, কোনো রশ্মির প্রতিফলন হিসাব করিতে হইলে যে জিনিষে রশ্মি আসিয়া পড়ে, তাহার সহিত পতন-বিন্দুতে একটা লম্ব টানিতে হয় এবং এই লম্বের সহিত প্রক্ষেপ-কোণ এবং প্রতিফলন-কোণ অবিকল একই হয়। ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়নার পিঠের কোনো দুইটি বিন্দু এক সমতলে থাকে না। তাই জ্যামিতির সাধারণ নিয়মে পিঠের উপরে লম্ব টানা যায় না। আয়নার বক্র অংশের কেন্দ্রের সঙ্গে তাহার পিঠের কোনো বিন্দু যোগ করিলে সেই বিন্দুর লম্ব

পাওয়া যায়। কাজেই, যে "চ ট" রশ্মি আয়নায় আসিয়া পড়িল, "ট ক" হইল তাহার লম্ব এবং "চ ট ক" হইল প্রক্ষেপ-কোণ। কিন্তু প্রক্ষেপ-কোণ প্রতিফলন-কোণের সহিত সমান থাকে। সুতরাং, প্রতিফলিত রশ্মি "ট ন" রেখা ধরিয়া যাইতে থাকিবে। এখন "প ত" রশ্মিটি প্রতিফলিত হইয়া কোন্ পথে যাইবে, ঠিক্ আগের মতো হিসাব কর। দেখিবে, প্রতিফলনের পরে তাহা "ত ন" রেখা ধরিয়া চলিবে। সুতরাং "ন" বিন্দুতে ঐ দুই রশ্মির মিলন ঘটিল। আরো দশ বিশটা সমান্তরাল রশ্মি লইয়া হিসাব কর, দেখিবে, সেগুলিও প্রতিফলনের পরে "ন" বিন্দুতেই আসিয়া মিলিতেছে। দিগ্‌বিদিগ্ হইতে যে সব আলোর রশ্মি আয়নায় পড়িতেছে, সেগুলির সকলেই যদি প্রতিফলনের পরে এক বিন্দুতে আসিয়া জমে, তবে কি হয় তোমরা বলিতে পার না কি? অনেক আলো একটা জায়গায় জমা হয় বলিয়া সেখানটা খুব উজ্জ্বল হইয়া পড়ে। এখানে সব রশ্মিই প্রতিফলনের পরে "ন" বিন্দুতে জমা হইতেছে বলিয়া, ঐ জায়গাটা উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়ায়। এই উজ্জ্বল জায়গাটার নাম অধিশ্রয় (Focus)। সুতরাং "ন" বিন্দু একটা অধিশ্রয়। ছবিতে দেখ, আলোর রশ্মিগুলি মধ্য-রেখার সঙ্গে সমান্তরাল হইয়া আয়নায় পড়িয়াছে এবং প্রতিফলনের পরে মধ্য-রেখার "ন" বিন্দুতে একত্র হইয়াছে। এই রকমে সমান্তরাল রশ্মির যে অধিশ্রয় মধ্যরেখাতে হয়, তাহাকে বলা হয় প্রধান-অধিশ্রয় (Principal Focus)। সুতরাং ছবির "ন" বিন্দুটাই প্রধান-অধিশ্রয়।

কিন্তু কেবল মধ্য-রেখার সহিত সমান্তরাল রশ্মিরই যে অধিশ্রয় হয়, তাহা নয়। সমান্তরাল রশ্মি যে-ভাবেই আসুক না কেন, সেগুলি প্রতিফলনের নিয়ম অনুসারে এক-একটা অধিশ্রয়ের সৃষ্টি করে। কিন্তু ইহা মধ্য-রেখায় থাকে না। এখানে যে-ছবিখানি দিলাম তাহা দেখিলে রশ্মিগুলি কিভাবে প্রতিফলিত হইয়া অন্য জায়গায় অধিশ্রয়ের সৃষ্টি করিতেছে,
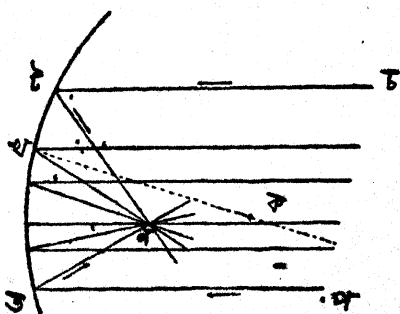
তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে। যদি ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়না কাছে পাও, তবে সূর্য্যের আলো ধরিয়া তাহার অধিশ্রয় কোথায় থাকে তোমরা পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, সত্যই সূর্য্যের সমান্তরাল রশ্মি আয়নায় পড়িয়া এক বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। এক টুকরা কাগজ ধরিলে জায়গাটাকে খুব উজ্জ্বল দেখাইবে এবং সেখানে আলোর রশ্মির সঙ্গে তাপের রশ্মিও জমা হয় বলিয়া কাগজখানি গরম হইয়া হয় ত শেষে জ্বলিয়া উঠিবে।

সাইকেল গাড়ির সম্মুখে যে-আলো থাকে, তাহা তোমরা

দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাকো, একটা ল্যাম্প খুলিয়া পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, ভিতরের যেখানে আলো জ্বলে তাহারই পিছনে একটা ন্যুব্জপৃষ্ঠ ছোটো আয়না লাগানো আছে। ল্যাম্পের আলো এই আয়নায় প্রতিফলিত হইয়া সমান্তরাল পথে সম্মুখে ছুটিয়া চলে। ইহাতেই সাইকেলের আলো বহুদূর পর্যন্ত যায়। কিন্তু আশে-পাশে আলো যায় না, আলো হয় কেবল সম্মুখের দিক্‌টায়। এই সব ল্যাম্পের আলো প্রতিফলিত হইয়া কেন সমান্তরাল পথে চলে, তোমরা বোধ হয় জানো না। আলোটা থাকে পিছনের আয়নার ঠিক্ প্রধান-অধিশ্রয়ের উপরে। তাই সেই আলো আয়নায় প্রতিফলিত হইয়া সমান্তরাল পথে চলিতে থাকে।
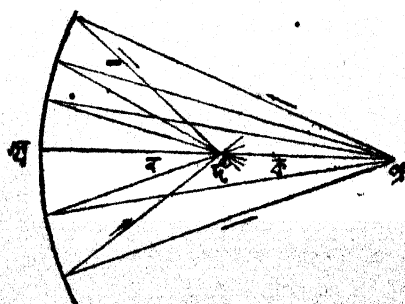
সমান্তরাল রশ্মির কথা বলা হইল। এখন সাধারণ প্রদীপের রশ্মির কথা বলিব। এই রশ্মিগুলি প্রদীপের শিখাকে কেন্দ্র করিয়া সব দিকে ছুটিয়া চলে। সুতরাং সমান্তরাল নয়। পরপৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। ছবিতে, ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়নার সম্মুখে "প্র"

চিহ্নিত জায়গায় একটি বাতি জ্বলিতেছে। বাতির আলো সেই আগের নিয়ম অনুসারে প্রতিফলিত হইয়া কি-রকমে "দ" বিন্দুতে অধিশ্রয়ের উৎপত্তি করিয়াছে, ছবি দেখিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে। "ক" আয়নার বক্রতার কেন্দ্র, "ন" বিন্দুটি প্রধান-অধিশ্রয়। তাহা হইলে "দ" অধিশ্রয়টি "ক" ও "ন" এর মাঝে রহিয়াছে। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, বাতিটি যেখানে থাকিয়া জ্বলুক না কেন, তাহার অধিশ্রয় "দ" বিন্দুতেই হইবে। কিন্তু তাহা নয় বাতিটিকে আয়না হইতে যত দূরে লওয়া যায়, ততই "দ" অধিশ্রয়, প্রধান-অধিশ্রয় "ন"-এর কাছে আসে খুব বেশি দূরে লইয়া গেলে যখন বাতির রশ্মি প্রায় সমান্তরাল হইয়া আয়নায় পড়ে, তখন "ন" এর সঙ্গে "দ" মিলিয়া যায়। আবার বাতিটিকে যতই আয়নার কাছে আনা যায়, ততই "দ" "ক"-এর কাছে আসিতে থাকে। শেষে বাতিটি ঠিক্ "ক"এ আসিয়া পড়িলে বাতির শিখা এবং তাহার অধিশ্রয় একত্র হইয়া যায়।

তাহা হইলে দেখ, ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়নার প্রধান-অধিশ্রয় একটি। কিন্তু নিকটের আলোর যে-সব বহির্মুখ (Divergent) রশ্মি আয়নায় আসিয়া পড়ে তাহাদের অধিশ্রয় একটি নয়। আলো যেমন সরিয়া বেড়ায় তাহার অধিশ্রয় সেই রকমে নড়াচড়া করে। আলো'কে খুব দূরে লইয়া গেলে তাহার অধিশ্রয় প্রধান-অধিশ্রয়ের কাছে আসে ; আবার সেই আলো'কেই আয়নার কাছে আনিলে তাহার অধিশ্রয় বক্রতার কেন্দ্রের কাছ-ঘেঁষা হয়। অর্থাৎ যদি একটি আলো'কে অনেক দূর হইতে ক্রমে "ক"-এর কাছে

আনিতে থাকো, তাহা হইলে তোমরা উহার অধিশ্রয়কে প্রধান-অধিশ্রয় "দ" হইতে ক্রমে "ক" এর দিকে সরিয়া আসিতে দেখিবে।

একটি বাতিকে অনেক দূর হইতে "ক" পর্য্যন্ত আনিলে তাহার অধিশ্রয় কি-রকমে বদলায় জানা গেল। এখন যদি বাতিটিকে আয়নার আরো কাছে আনা যায়, তাহা হইলে কি হয় দেখা যাউক। তোমরা যদি আগেকার ছবির মতো আয়না সাজাইয়া পরীক্ষা করিতে পার, তবে দেখিবে, বাতি যেমন "ক" ও "দ" বিন্দুর ভিতরে আসে, অমনি তাহার অধিশ্রয় "ক"-এর বাহিরে চলিয়া যায়। কেবল ইহা নয়; বাতি যত "দ"-এর কাছাকাছি হইতে থাকে, ততই তাহাব অধিশ্রয় দূরে যাইতে আরম্ভ করে। শেষে বাতি প্রধান-অধিশ্রয় "দ" বিন্দুতে আসিলে তাহার অধিশ্রয় এত দূরে চলিয়া যায় যে, তাহার সন্ধানই হয় না। অর্থাৎ তখন রশ্মিগুলি সমান্তরাল হইয়া ছুটিয়া চলে। প্রধান-অধিশ্রয়ে বাতি রাখিলে তাহার রশ্মি প্রতিফলনের পরে যে সমান্তরাল হয়, তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। এখনে তাহাই ঘটিল।

এখনো যদি আলোটিকে আয়নার কাছে লইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে সে আলোর আর সত্য অধিশ্রয় (Real focus) হয় না। সাধারণ সমতল আয়নার যেমন একটা মিথ্যা প্রতিবিম্ব পিছনে দেখা যায়, এখানেও সে-রকমের একটা মিথ্যা অধিশ্রয় আয়নার পিছনে থাকে। তাহা হইলে দেখ, ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়নায় কোনো বাতির শিখাকে যতই বক্রতার কেন্দ্র "ক" হইতে

প্রধান-অধিশ্রয় "দ" এর কাছে আনা যায় ততই বাতির অধিশ্রয় বক্রতার কেন্দ্র হইতে অতি দূরে সরিয়া যায়। কিন্তু সেই বাতিকে প্রধান-অধিশ্রয় ও আয়নার মাঝামাঝি কোনো জায়গায় লইয়া গেলে তাহার সত্য অধিশ্রয় কোনো জায়গাতেই দেখা যায় না।

ইহা ছাড়া আলোর সহিত তাহার অধিশ্রয়ের আর একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তোমরা বোধ করি তাহা লক্ষ্য কর নাই। পূর্ব্বের ছবিখানি দেখ; তাহাতে "প্র" বিন্দুতে যে আলো রহিয়াছে, তাহার অধিশ্রয় হইয়াছে "দ" বিন্দুতে। এখন যদি তোমরা আলোটিকে "দ" বিন্দুতে রাখিয়া দাও, তবে তাহার অধিশ্রয় "প্র" বিন্দুতে হইতে দেখিবে। আলো ও তাহার অধিশ্রয়ের এই রকম একটা পাল্‌টা সম্বন্ধ আছে। এই জন্য সমান্তরাল আলো ছাড়া অন্য আলোর যে অধিশ্রয় হয় তাহাকে বলা যায় সম্বন্ধী-অধিশ্রয় (Conjugate Focus)।

ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়নার প্রতিবিম্ব

ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়নায় কি-রকমে রশ্মি প্রতিফলিত হয় এবং কি-রকমেই বা তাহার অধিশ্রয় উৎপন্ন হয়, বলা হইল। এখন এই রকম আয়নার প্রতিবিম্বগুলি কখনো বড়, কখনো ছোটো, কখনো সোজা, কখনো উল্‌টা হয় কেন, সে-সব কথা তোমাদিগকে বলিব। কিন্তু একখানা ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়না কাছে না রাখিলে হয় ত সব কথা বুঝিতে পারিবে না।

পরপৃষ্ঠায় একখানা ছবি দিলাম। একটা ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়নার সম্মুখে একটা বাতি জ্বলিতেছে। "ক" বিন্দু আয়নার বক্রতার কেন্দ্র এবং "ন" যেন তাহার প্রধান অধিশ্রয়। বাতি দূরে আছে। কাজেই আগের নিয়ম অনুসারে উহার অধিশ্রয়, "ক" এবং "ন" বিন্দুর মাঝামাঝি কোনো জায়গায় হইবে এবং বাতির প্রতিবিম্বও ঠিক্ সেই জায়গায় পড়িবে। ছবিতে দেখ, ঐ জায়গায় একটা পর্দ্দা রাখা হইয়াছে, তাহাতে বাতির একটা ছোটো কিন্তু উল্‌টা

ছবি পড়িয়াছে। স্যুজ্জষ্ঠ আয়নায় দূরের জিনিষের প্রতিবিম্ব ঠিক্ এই রকমেই হয়।
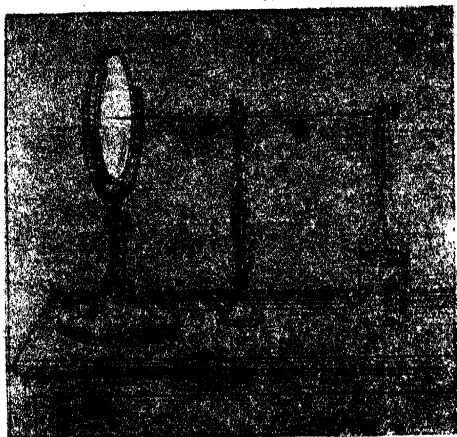
ইহার পরের ছবিখানি দেখ। এখানে বাতিটিকে রাখা হইয়াছে বক্রতার কেন্দ্র "ক" এবং প্রধান অধিশ্রয় "ন" বিন্দুর মাঝে। কাজেই, আলোর সম্বন্ধী-অধিশ্রয় হইবে বক্রতার কেন্দ্রের বাহিরে। দেখ, ছবিতে বাতির প্রতিবিম্ব ঐ কেন্দ্রের বাহিরেই পড়িয়াছে। কিন্তু প্রতিবিম্বটি উল্‌টা এবং বাতির চেয়ে অনেক বড়। বাতিকে যতই প্রধান অধিশ্রয়ের কাছে আনা যায়,

ততই তাহার প্রতিবিম্ব বড় হয়, কিন্তু উল্টাইয়া থাকিয়া যায়। দেখ, ছবিতে যে পর্দ্দা আছে, তাহাতে বাতির প্রতিবিম্ব উল্টা ও বড় হইয়া পড়িয়াছে।
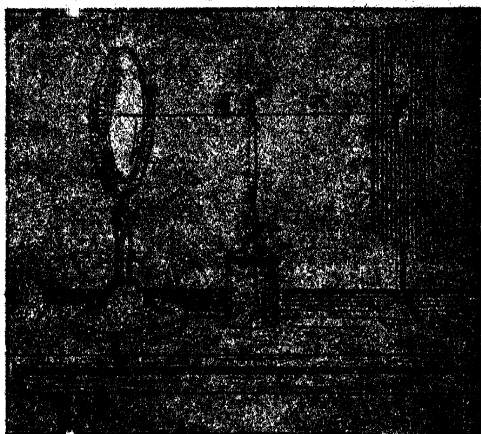
ইহার পরে যে ছবিটি দিলাম, তাহাতে বাতিটিকে আয়নার খুব কাছে অর্থাৎ প্রধান অধিশ্রয় ও আয়নার মাঝে আনা হইয়াছে। দেখ, এই অবস্থায় প্রতিবিম্বটি খুব বড় এবং সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহা মিথ্যা প্রতিবিম্ব (Virtual Image)। ইহাকে কোন পর্দ্দার উপরে ফেলা যায় না। সাধারণ সমতল

আয়নার প্রতিবিম্বের মতো ইহাকে আয়নার পিছনে দেখা যাইতেছে। সমতল আয়নার প্রতিবিম্ব যেমন মিথ্যা এবং চোখের ভুল, এই প্রতিবিম্বও তাহাই।
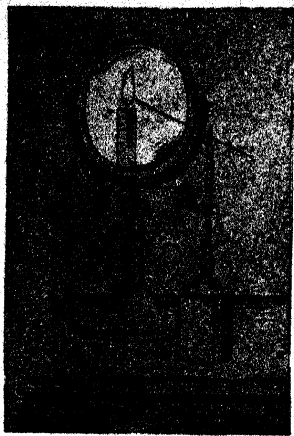
তোমরা যদি একখানি ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়না হাতে পাও, তবে এই সকল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো। দূরে রাখিয়া মুখ দেখিতে গেলে এই আয়নাতে মুখ দেখা যায় না। কারণ, তখন প্রতিবিম্ব পড়ে সামনে। সেখানে কাগজের ছোটো টুক্‌রা রাখিলে নিজের মুখের উল্‌টা ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। আয়নাকে আরো কাছে আনিলে প্রতিবিম্ব পড়ে পিছন দিকে। কাজেই, সেখানে কাগজের টুক্‌রা না ধরিলে প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। ইহার পরেও যদি আয়নাকে কাছে আনা যায়, তবেই মুখের খুব বড় ও সোজা প্রতিবিম্ব আয়নার পিছনে দেখা যাইতে থাকে। নিজের মুখের ছবিকে বড় করিয়া দেখার জন্য লোকে সাধারণতঃ এই আয়না ব্যবহার খুব করে।

কুব্জপৃষ্ঠ আয়নার প্রতিবিম্ব

কি-রকম আকৃতির আয়নাকে আমরা কুব্জপৃষ্ঠ (Convex) বলিতেছি, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। কড়াইয়ের তলার দিক্‌টা যেমন উঁচু সেই রকম কাচের তলায় পারা লাগানো আয়নাকে কুব্জপৃষ্ঠ আয়না বলা হইয়া থাকে। ভালো পালিশ-করা ধাতু দিয়াও এই আয়না তৈয়ার করা যায়। সম্মুখের দিক্‌টা কুঁজো বলিয়াই ইহার নাম হইয়াছে কুব্জপৃষ্ঠ। কিন্তু এই আয়না প্রায়ই বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় না, প্রতিদিনের কাজেও লাগে না।

ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়নায় কি-রকম সত্য প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়, তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি। কুব্জপৃষ্ঠ আয়নায় কিন্তু কখনই সত্য প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় না। এই আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইলে তোমাদের মুখের ছবিগুলিকে খুব ছোটো আকারে দেখিতে পাইবে। ইহা সাধারণ সমতল আয়নার মতো মিথ্যা প্রতিবিম্ব। অর্থাৎ তাহাকে কখনই কাগজের উপরে ফেলিয়া ধরা যাইবে না। পরপৃষ্ঠায় একটি ছবি দিলাম। দেখ, কুব্জপৃষ্ঠ

আয়নার সম্মুখে যে বাতিটি জ্বলিতেছে তাহার প্রতিবিম্ব কত ছোটো দেখাইতেছে। এই আয়নার বাঁকা পিঠে কি রকমে
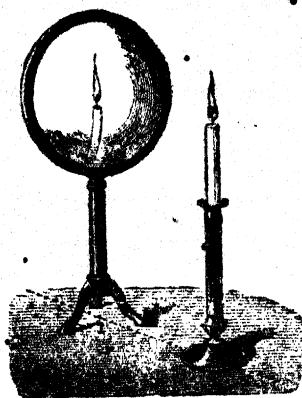
আলোর রেখা প্রতিফলিত হইয়া প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করিয়াছে, তাহা ছবিখানি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

কাঁসার গ্লাস মাজিয়া ঘসিয়া চক্‌চকে করিলে, তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে। ইহা তোমরা দেখ নাই কি? তোমরা একটা গ্লাসের কাছে মুখ রাখিয়া মুখের ছবি দেখিয়ো। সাধারণ সমতল আয়নার ছবি যেমন সুন্দর হয়, এই ছবি কখনই সে-রকম হয় না। প্রতিবিম্বের নাক কান চোখ ও মুখকে কখনো লম্বা বা কখনো চেপ্‌টা দেখায়। নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তখন যেন হাসি পায়।

বিবর্ত্তন

আয়না বা আয়নার মতো চক্‌চকে জিনিষে আলোর রশ্মি পড়িলে তাহা সেখানে ঠিক্‌রাইয়া প্রতিফলিত হয়। প্রতিফলিত আলো যে-পথে চোখে আসিয়া পড়ে, আমরা আলো'কে সেই পথেরই পিছনে দেখিতে পাই। এসকল কথা তোমরা শুনিয়াছ। এখন তোমাদিগকে আলোর রশ্মির আর এক রকম পরিবর্ত্তনের কথা বলিব।

জল ও বাতাস উভয়েই স্বচ্ছ জিনিষ। তাই জলের ও বাতাসের ভিতর দিয়া আলো অবাধে চলা-ফেরা করিতে পারে। কিন্তু জল ও বাতাসের ঘনতা কি একই রকম? কখনই নয়। দুধের চেয়ে যেমন ক্ষীর ঘন, সেই রকম বাতাসের চেয়ে জল ঘন। এখন যদি বাতাস ও জলের ভিতর দিয়া কোনো আলোর রশ্মি একটু হেলিয়া চলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে একটা বড় মজার ব্যাপার দেখা যায়। তোমরা জানো, আলোর রশ্মি কোনো অস্বচ্ছ জিনিষে আট্‌কাইয়া না গেলে ঠিক্ সোজা পথে চলে। কিন্তু এখানে তাহা দেখা যায় না। রশ্মিটি বাতাসের ভিতর দিয়া সোজা আসিয়া যেই জলে প্রবেশ করিতে যায়, অমনি একটু বাঁকিয়া যায়।

কথাটা বোধ করি তোমরা বুঝিলে না। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় একটা

ছবি দিলাম। ছবিতে দেখ একটি বাতি জ্বলিতেছে এবং বাতির আলোর একটি রশ্মি বাতাসের ভিতর দিয়া "ক খ" পথে জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।
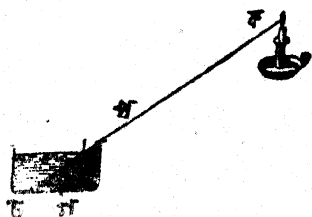
দেখ, ইহা সোজা পথ ধরিয়া জলে প্রবেশ করে নাই, বেশ একটু বাঁকিয়া "গ" বিন্দুতে গিয়া ঠেকিয়াছে। যদি না বাঁকিত তাহা হইলে উহা "চ" বিন্দুতে পৌঁছিত। এসম্বন্ধে একটু সুন্দর পরীক্ষা আছে। তোমরা তাহা করিয়া দেখিয়ো। সকালে বা বিকালে যখন রৌদ্র ঘরে প্রবেশ করিবে, তখন দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ঘরটিকে অন্ধকার করিয়ো। দেখিবে, হয় ত তখন জানালার ছোটো ফাঁক দিয়া দুই একটি আলোর রশ্মি ঠিক্ সোজা পথে ঘরে আসিয়া পড়িতেছে। এখন যদি এক গামলা পরিষ্কার জলের উপরে এই রশ্মিকে ফেলিতে পার, তবে দেখিবে, যে-পথে সেটি ঘরের ভিতরে চলিতেছিল, জলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে-পথে চলিতেছে না,—বেশ একটু বাঁকিয়া চলিতেছে। সুতরাং পাত্‌লা জিনিষ হইতে ঘন জিনিষে প্রবেশ করিবার সময়ে যে, আলোর রশ্মি মুখ ফিরাইয়া বাঁকিয়া চলে, এই পরীক্ষায় তাহা বুঝা যায়। কেবল ইহাই নয়, ঘন জিনিষ হইতে পাতলা জিনিষে প্রবেশ করিবার সময়েও আলোর পথের পরিবর্ত্তন হয়। ইহার উদাহরণ তোমাদিগকে পরে অনেক বলিব। যাহা হউক, আলোর

রশ্মির এই রকমে বাঁকিয়া চলাকেই বৈজ্ঞানিকেরা বিবর্ত্তন (Refraction) বলেন। বাতাস হইতে জলে, জল হইতে বাতাসে, কাচ হইতে তেলে এবং তেল হইতে কাচে, অর্থাৎ যে-কোনো দুইটি অসমঘন স্বচ্ছ বস্তুর ভিতর দিয়া যাইবার সময়ে আলোর রশ্মিমাত্রেরই বিবর্ত্তন হয়।

এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, স্বচ্ছ জিনিষের ভিতর দিয়া আলো সরল পথেই চলে। তবে তাহার পথের পরিবর্ত্তন হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তোমাদিগকে এখন কিছুই বলিব না। কিন্তু জানিয়া রাখিয়ো আলোর পথের এই পরিবর্ত্তন
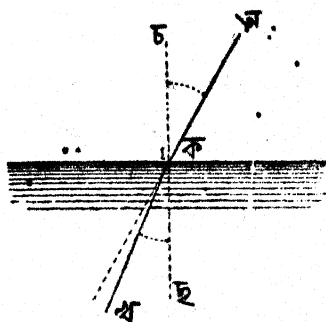
অনিয়মে হয় না। প্রতিফলনের যেমন একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম আছে, তেমনি বিবর্ত্তনেরও একটা নিয়ম আছে। সেই নিয়মের কথাই তোমাদিগকে এখন বলিব।

উপরে যে ছবিটি দিলাম, তাহা দেখিলেই বুঝিবে, একটা আলোর রেখা জলে প্রবেশের সময়ে বিবর্ত্তিত হইয়া বাঁকিয়া

চলিয়াছে। "অ ক" বাতাসের এবং "ক খ" জলের ভিতরকার পথ। "ক" বিন্দুতে জলের উপরিভাগের সহিত সমকোণ করিয়া "চ ক ছ" লম্ব টানা গিয়াছে। "চ ক অ" কোণকে প্রক্ষেপ-কোণ (Angle of Incidence) এবং "খ ক ছ" কোণকে বিবর্ত্তন-কোণ (Angle of Refraction) বলা হয়। দেখ, এই দুই কোণ সমান নয়। এখানে প্রক্ষেপ-কোণ বিবর্ত্তন-কোণের চেয়ে বড়। পাতলা স্বচ্ছ জিনিষ হইতে ঘন স্বচ্ছ জিনিষে যাইবার সময়ে, প্রক্ষেপ-কোণ বিবর্ত্তন-কোণের চেয়ে সকল সময়েই বড় থাকে, কিন্তু প্রক্ষেপ-রশ্মি ও বিবর্ত্তিত রশ্মিকে কখনই পৃথক্ সমতলে থাকিতে দেখা যায় না। কেবল ইহাই নয়, প্রত্যেক দুইটি জিনিষের প্রক্ষেপ ও বিবর্ত্তন-কোণের মধ্যে এক-একটা বিশেষ সম্বন্ধ থাকে। সে-সব কথা তোমাদিগকে এখানে কিছুই বলিব না। আলোক-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তোমরা যখন বড় বড় বই পড়িবে, তখন তাহা জানিতে পারিবে। মনে রাখিয়ো, প্রক্ষেপ-রশ্মি যখন লম্বভাবে আসিয়া স্বচ্ছ জিনিষে প্রবেশ করে তখন তাহার বিবর্ত্তন হয় না। আলো যত বাঁকিয়া আসে তাহার বিবর্ত্তন ততই সুস্পষ্ট নজরে পড়ে। পূর্ব্বের ছবিখানার "অ ক" আলোক রেখা যদি "চ ক" পথে লম্বভাবে জলে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে উহা বিবর্ত্তিত না হইয়া "ক ছ" রেখায় ঠিক সোজা চলিত।

এখন আলোর বিবর্ত্তনের আরো কয়েকটি ঘটনার কথা তোমাদিগকে বলিব। এই সকল ঘটনা প্রতিদিনই নজরে পড়ে, কিন্তু আমরা তাহার কারণ অনুসন্ধান করি না। ছবিতে যে-রকম

আঁকা আছে, সেই রকমে একটা লাঠিকে টেরছাভাবে জলে ডুবাইয়া রাখ। দেখিবে, উহার জলের তলার অংশটিকে সুস্পষ্ট বাঁকা দেখাইতেছে। মনে হইবে, কে যেন লাঠি গাছটিকে
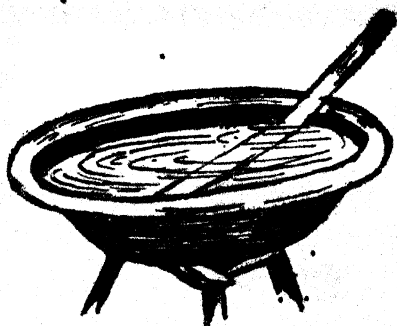
মুচড়াইয়া রাখিয়াছে। কেন এমন দেখায় তোমরা বলিতে পার কি? লাঠির জলের উপরকার অংশের আলো প্রত্যক্ষভাবে চোখে পড়ে। কিন্তু জলের তলাকার অংশ হইতে যে আলো আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে, তাহা জল ছাড়িয়া বাতাসে আসিবার সময়ে বিবর্ত্তিত হইয়া বাঁকিয়া আসে। কাজেই, আমরা যখন সেই আলোর পথে জলের তলাকার অংশটাকে দেখি, তখন জলের উপরকার অংশের সঙ্গে তলাকার অংশের মিল থাকে না। ইহাতেই লাঠিকে বাঁকা দেখায়।

পরপৃষ্ঠায় আর একখানি ছবি দিলাম। দেখ, কোনো পাত্রে একটা পয়সা ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। ছবিতে পয়সাটি "প" জায়গায় আছে। মনে কর, তুমি ঘাড় হেঁট করিয়া পয়সাটিকে

দেখিতে যাইতেছ, কিন্তু তাহা চোখে পড়িতেছে না; পাত্রের কাণায় তোমার দৃষ্টি আট্‌কাইয়া যাইতেছে। এখন যদি ধীরে ধীরে পাত্রে জল ঢালা যায়, তবে দেখিবে, পয়সাটি আর পাত্রের কাণার আড়ালে না থাকিয়া সুস্পষ্ট তোমার নজরে পড়িতেছে।
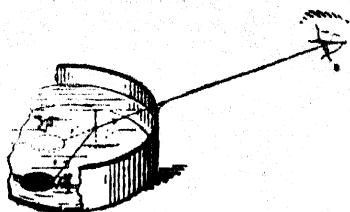
চোখ নড়িল না, এবং পয়সাও নড়িল না, তবে তাহাকে এখন দেখা যায় কেন? পয়সাকে প্রত্যক্ষ দেখা না গেলেও এখন তাহার আলোক-রেখা জল হইতে বাহির হইয়া বাঁকিয়া চোখে পড়িতেছে। কিন্তু তোমরা জানো, কোনো জিনিষের আলো যে-পথে চোখে পড়ে, জিনিষটিকে সেই পথেরই পিছনে দেখা যায়। কাজেই, আড়ালের আলো বিবর্ত্তনের পরে বাঁকিয়া চোখে পড়িতেছে বলিয়া, তাহাকে এখন দেখা যাইতেছে। কিন্তু আসল পয়সাটি আছে আড়ালে। এখন তোমরা যাহাকে পয়সার আকারে দেখিতেছ, তাহা মায়া মাত্র,—দৃষ্টিবিভ্রমে তাহার উৎপত্তি। জলে হাত ডুবাইয়া সেই জায়গায় পয়সাটিকে ধরিতে যাও, ধরিতে পারিবে না,—কারণ, আসল পয়সা সেখানে নাই।

স্নানের সময়ে পাশে দাঁড়াইয়া চৌবাচ্চার জলের দিকে তাকাইলে একটা মজার ব্যাপার দেখা যায়। তখন চৌবাচ্চার তলাটাকে উঁচু মনে হয়। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? চৌবাচ্চা যখন জলে ভর্ত্তি থাকিবে, তখন লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্ট দেখা যাইবে। কেন এমন দেখায়, তোমরা বোধ হয় এখন নিজেরাই বলিতে পারিবে। চৌবাচ্চার তলার আলোর রশ্মি জল হইতে বাহির হইয়া যখন চোখে পড়ে তখন একই সরল পথে আসে না; জল হইতে বাতাসে প্রবেশের সময়ে তাহার পথ বাঁকিয়া যায়। কাজেই, আমরা সেই বাঁকা আলোক-পথের পিছনে চৌবাচ্চার তলা দেখিতে পাই। ইহাতেই তলা উঁচু দেখায়। কেবল ইহাই নয়। একটা ঘটি বা বাটিকে জলে অর্দ্ধেক ডুবাইলে তাহার জলের তলাকার অংশকে চেপ্‌টা দেখায়। নৌকার তলার যে-অংশ জলের তলায় থাকে, বাহির হইতে দেখিলে তাহার ঠিক্ আকৃতি বুঝা যায় না। এগুলিও আলোক-রশ্মির বিবর্ত্তনের ফল। চৌবাচ্চার জলে যখন নানা রঙের ছোটো মাছ খেলা করিয়া বেড়ায়, তখন আমরা সেগুলিকে ঠিক জায়গায় দেখিতে পাই না। জলে হাত ডুবাইয়া মাছগুলিকে ধরিতে গেলে মাছের গায়ে হাত পড়ে না। গামলার জলে একটা পয়সা ফেলিয়া পাশে চোখ রাখিয়া সেটিকে উঠাইতে যাও, দেখিবে, যেখানে পয়সাটি আছে সেখানে হাত পড়িতেছে না। জল হইতে বাহির হইয়া যে-সব আলোর রশ্মি চোখে পড়ে, সেগুলি বাতাসে প্রবেশ করিবার সময়ে বাঁকিয়া আসে বলিয়াই এই সকল ঘটনা দেখা যায়।

চন্দ্র-সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্রের উদয়াস্ত-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের কাছে একটা বড় অদ্ভুত কথা শুনা যায়। তাঁহারা বলেন, প্রকৃত উদয়ের অনেক আগে আমরা চন্দ্র-সূর্য্যকে আকাশের গায়ে দেখিতে পাই এবং অস্তের অনেক পর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পশ্চিম আকাশে দেখা যায়। কথাটা অদ্ভুত নয় কি? সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, অথচ তাহাকে দেখা যাইতেছে, ইহা যেন বিশ্বাসই হয় না। কিন্তু ইহা সত্য।

এই বিষয়টি বুঝিতে হইলে কয়েকটি কথা তোমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। তোমরা সকলেই জানো, এই পৃথিবীকে ঘিরিয়া প্রায় পঞ্চাশ-ষাট মাইল গভীর একটি বাতাসের আবরণ আছে। কিন্তু এই বাতাসের গাঢ়তা আগাগোড়া একই নয়। মাটির কাছের বাতাসের গাঢ়তা যত, আকাশের উঁচু জায়গার বাতাসের গাঢ়তা তাহার চেয়ে অনেক কম। এইজন্যই খুব উঁচু পর্ব্বতের উপরকার পাত্‌লা বাতাসে নিশ্বাসের কাজ চালানো কষ্টকর হয়। উড়ো জাহাজে চাপিয়া যাঁহারা আকাশের খুব উঁচুতে উড়িয়া বেড়ান, তাঁহাদের কাছেও ঐ কথা শুনা যায়। তাহা হইলে দেখ, আকাশের এই বায়ুমণ্ডলকে ঘনতা-অনুসারে স্তরে স্তরে ভাগ করা চলে। মাটির কাছের স্তরের ঘনতা থাকে সব চেয়ে বেশি। তা'র পরে স্তর যত উপরে থাকে তাহার ঘনতা কমিতে আরম্ভ হয়।

পরপৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। দেখ, ছবিতে পৃথিবীর উপরকার কয়েকটি বায়ুস্তর আঁকা আছে। উপরকার স্তরের চেয়ে নীচেকার স্তরগুলি ক্রমে ঘন হইয়াছে। এখন মনে কর,

"স" চিহ্নিত জায়গায় যেন সূর্য্য রহিয়াছে এবং তাহার একটি রশ্মি টেরচাভাবে স্তরগুলিকে ভেদ করিয়া যেন নীচে নামিতেছে। কিন্তু আলোর রশ্মি যখন পাত্‌লা স্বচ্ছ জিনিষ হইতে ঘন জিনিষে প্রবেশ করে, তখন তাহার বিবর্ত্তন হয়, অর্থাৎ তাহার পথ বাঁকিয়া যায়। ছবিতে তাহাই আঁকা আছে। দেখ, ছবির "ক"
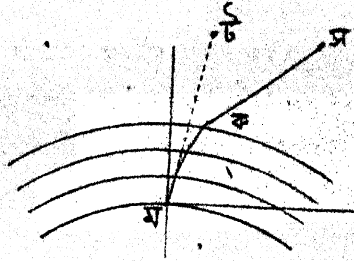
বিন্দুতে আলোর রশ্মি প্রথমে বাঁকিয়াছে: এবং তা'র পরে প্রত্যেক স্তরে আরো বাঁকিতে বাঁকিতে মাটির উপরকার "ম" জায়গায় পৌঁছিয়াছে। এখন যদি এই রশ্মি কোনো লোকের চোখে পড়ে, তবে সে সূর্য্যকে কোথায় দেখিবে? রশ্মি যে-পথে চোখে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারি পিছনে দেখিবে না কি? দেখ, এই রকমে সূর্য্যকে "ট" চিহ্নিত জায়গায় দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ আসল সূর্য্য যেখানে আছে, তাহার অনেক উপরে সূর্য্যকে দেখা যাইতেছে। কাজেই বলিতে হয়, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্রদিগকে আমরা যে-জায়গায় দেখি তাহারা সত্যই সে-জায়গায় থাকে না, তাহারা অনেক নীচেতে থাকে। কেবল বিবর্ত্তনের জন্য সেগুলিকে উপরে দেখায়। ইহা হইতেই বলা যাইতে পারে, অস্তের অনেক পরে এবং উদয়ের অনেক আগে আমরা জ্যোতিষ্কদিগকে আকাশের গায়ে দেখিতে পাই।

চরম বিবর্ত্তন ও পূর্ণ প্রতিফলন

তোমরা আগেই শুনিয়াছ, আলোর রশ্মি বিভিন্ন গাঢ়তার এক স্বচ্ছ জিনিষ হইতে অন্য স্বচ্ছ জিনিষে প্রবেশ করার সময়ে বিবর্ত্তিত হয়। সেই সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা তোমাদিগকে এখন বলিব।
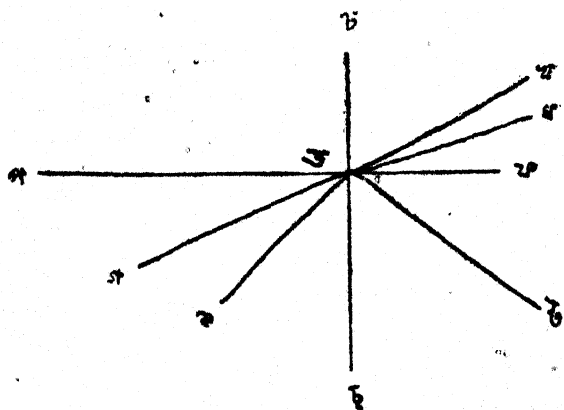
ছবিতে দেখ, "প ফ" রেখার নীচে জল ও উপরে বাতাস আছে। "ক ত" আলোর রেখা জলের ভিতর দিয়া আসিয়া বিবর্ত্তনের পর যেন "ত খ" পথে বাতাসে প্রবেশ করিয়াছে। "চ ত ছ" রেখাটি জলের পিঠের সহিত লম্বভাবে টানা আছে।

আলোর রশ্মি জল হইতে পাত্‌লা বাতাসে প্রবেশ করিতেছে। কাজেই "ক ত ছ" প্রক্ষেপ-কোণ, "চ ত খ" বিবর্ত্তন-কোণের চেয়ে ছোটো হইয়াছে। এখন মনে কর, আলোর রশ্মি যেন একটু সরিয়া "গত" রেখায় চলিয়াছে। কাজেই, এখন বিবর্ত্তন-কোণ বাড়িয়া "চ ত ঘ" হইয়া দাঁড়াইবে। এই রকমে প্রক্ষেপ-কোণকে যদি ক্রমাগত বাড়ানো যায়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ত্তন কোণও বাড়িয়া চলিবে না কি? নিশ্চয়ই বাড়িবে এবং বাড়িতে বাড়িতে এমন অবস্থায় আসিবে যখন তাহা জলের তল "ত ফ"-এর সঙ্গে মিলিয়া যাইবে। বিবর্ত্তনের এই অবস্থাকে বলা হয় চরম-বিবর্ত্তন। এই সময়ে বিবর্ত্তন কোণ ঠিক্ এক সমকোণের সমান হয়; ইহাকে আর বাড়ানো যায় না। চরম-বিবর্ত্তনের পরেও যদি প্রক্ষেপ কোণ "গ ত ছ"কে আরো বাড়ানো যায়, তখন "গত" রশ্মি "ত" বিন্দুতে প্রতিফলিত হইয়া "ত ট" রেখার মতো পথে চলিতে আরম্ভ করে। কোনো চক্‌চকে জিনিষের উপরে আলোর রশ্মি না পড়িলে তাহার প্রতিফলন হয় না। ইহা তোমরা জানো। কিন্তু এখানে দেখা গেল, দুইটি অসমঘর্ন জিনিষের ভিতর দিয়া চলিবার সময়েও আলোক-রশ্মির প্রতিফলন হয়। ইহা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু সত্যই এই প্রতিফলন দেখা যায়। তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, আয়নার উপরে আলো পড়িলে তাহার যে-প্রতিফলন হয়, তাহাকে পূর্ণ-প্রতিফলন বলা যায় না। এই আলোর কতক আয়নায় চুষিয়া লয় এবং বাকিটাই কেবল প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এখানে যে-

প্রতিফলনের কথা বলিলাম, তাহাতে একটু আলোরও ক্ষয় হয় না ; ষোল আনা আলোই প্রতিফলিত হয়। এই জন্যই এই প্রতিফলনকে বলা হয় পূর্ণ-প্রতিফলন (Total Reflection)।

পূর্ণ-প্রতিফলনের অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। একটা কাচের গ্লাসের অর্দ্ধেকটা জলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে একটা কলম ডুবাইয়া রাখো এবং তা'র পরে ধীরে ধীরে গ্লাসটিকে হাতে করিয়া চোখ ছাড়াইয়া কপালের কাছ পর্য্যন্ত উঁচু কর। এখন যদি তোমরা গ্লাসের জলের দিকে নজর কর, তবে দেখিবে, তাহার উপরটা যেন আয়নার মতো ঝকমক করিতেছে। কেবল ইহাই নয়, আয়নায় যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তেমনি কলমের প্রতিবিম্ব জলের নীচেতে দেখা যাইতেছে। ইহা পূর্ণ-প্রতিফলনের একটি সুন্দর উদাহরণ।

দেওয়ালগিরি বা ঝাড়ের পলকাটা কাচের কলমে রাত্রিতে যখন বাতির আলো পড়ে, তখন সেগুলি কত ঝল্‌মল্ করে তাহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। এই কাচের কলমগুলি কেবল বাহারের জন্য ঝাড়-লণ্ঠনে লাগানো থাকে না। যাহাতে সেগুলির ভিতরে আলোর রশ্মি প্রবেশ করিয়া সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়, তাহারি জন্য এই ব্যবস্থা। ভিতরে আলোর পূর্ণপ্রতিফলন হয় বলিয়া সেগুলিকে এত ঝক্‌মক্ করিতে দেখা যায়। হীরার আংটি বা হীরার কণ্ঠীতে আলো পড়িলে কত উজ্জ্বল দেখায়, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত তাহা দেখিয়াছ। ইহাও আলোর পূর্ণ-প্রতিফলনের উদাহরণ। জহুরীরা হীরা পান্না ও অন্য দামী পাথরগুলিতে এমন-

ভাবে পল কাটে যে, সেগুলির ভিতরে আলোর রশ্মি প্রবেশ করিয়া হঠাৎ বিবর্ত্তিত হইয়া বাহিরে আসে না। সেগুলি ভিতরে থাকিয়া বার বার পূর্ণ-প্রতিফলিত হয়। তাই হীরা পান্না প্রভৃতি পাথরগুলিকে সাধারণ আলোতে এত উজ্জ্বল দেখায়। কাচের বাসন ফাটিয়া গেলে, ফাটা জায়গাগুলি যেন রূপার মতো তক্-তক্ করে। জল হইতে যখন ছোটো-বড় বুদ্বুদ উঠে, তখন সেগুলিকেও যেন রূপা দিয়া তৈয়ারি বলিয়া মনে হয়। এগুলিও আলোক-রশ্মির পূর্ণ-প্রতিফলনের উদাহরণ। তাছাড়া আশ্বিনের সকাল বেলায় পাতার ডগায় ডগায় যখন শিশিরের বিন্দু হীরার দুলের মতো দুলিতে থাকে এবং ফোয়ারার জলের ধারা যখন গলিত রূপার মতো উপরে উঠিতে থাকে, তখনো আমরা জলের ভিতরকার আলোক-রশ্মির পূর্ণ-প্রতিফলনের পরিচয় পাই।

মরীচিকা

দুপুর বেলায় মরুভূমির ভিতর দিয়া চলা-ফেরা করা কত কষ্টের, তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। সেখানে দুই-একটা খেজুর গাছ ছাড়া আর গাছপালা থাকে না, এমন কি, সেখানকার মাটিতে একটা সবুজ ঘাসও দেখা যায় না। শত শত মাইল ধরিয়া কেবল সাদা বালি ধু-ধু করিতে থাকে। তৃষ্ণা পাইলে যে একটু জল খাওয়া যাইবে তাহারো উপায় থাকে না। মরুভূমিতে নদী-পুষ্করিণী নাই। আমাদের দেশে বর্ষাকালের একদিনে যে বৃষ্টি হয়, সে অঞ্চলে এ বৎসরেও ততটুকু বৃষ্টি হয় না। কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য এই দেশ দিয়া লোকজনের যাওয়া-আসা করিতে হয়। জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে উটেরা খুব গরম সহ্য করিতে পারে। তাই, উটের পিঠে মালপত্র ও জালা-জালা খাবার জল বোঝাই দিয়া সওদাগরেরা মরুভূমির ভিতর দিয়া যায়। যদি রাস্তার মাঝে খাবার জল ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! পথিকেরা তৃষ্ণায় মারা যায়।

যাহা হউক দুপুর রৌদ্রে যখন মরুভূমি খাঁ-খাঁ করিতে থাকে, তখন একটা মজার দৃষ্টিবিভ্রম নজরে পড়ে। মনে কর, মরুভূমির খুব দূরে একটা খেজুর গাছ দাঁড়াইয়া আছে। দুপুর বেলার রৌদ্রে পথিকেরা সেই দিকে তাকাইলেই দেখিতে পায়

যেন গাছের নীচে একটা সুন্দর জলাশয় আছে, এবং তাহাতে গাছের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। এই দৃষ্টিবিভ্রমের নাম মরীচিকা। গাছ থাকে, কিন্তু জল থাকে না। জলাশয় আছে মনে করিয়া প্রাণ ভরিয়া জল খাইবার ইচ্ছায় পথিকেরা সেই দিকে ছুটিয়া চলে এবং শেষে নিরাশ হয়। এই রকম মরীচিকার প্রলোভনে পথিকেরা মরুভূমির মধ্যে রৌদ্রে ছুটাছুটি করিয়া মারা গিয়াছে, ইহাও আমরা শুনিয়াছি। ছেলেবেলায় যখন মরীচিকার গল্প শুনিতাম, তখন তাহাতে বিশ্বাস হইত না। কিন্তু ইহা সত্য। পুকুরের জলে যেমন গাছপালার প্রতিবিম্ব দেখা যায়, মরুভূমির তপ্ত বালির উপরে দূরের গাছপালার ঠিক্ সেই রকমেরই প্রতিবিম্ব নজরে পড়ে। কেমন করিয়া এই দৃষ্টিবিভ্রম হয় সেই কথাটা তোমাদিগকে এখানে বলিব।

পৃথিবীকে ঘিরিয়া যে-বায়ুমণ্ডল আছে, তাহার নীচের বাতাস গাঢ় এবং উপরের বাতাস পাত্‌লা, ইহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কিন্তু মরুভূমির বাতাসে ইহারি ঠিক্ উল্‌টা দেখা যায়। সেখানে ঠিক্ মাটির উপরকার বাতাস পাত্‌লা এবং উঁচু জায়গার বাতাস গাঢ়। কেন ইহা হয়, বলা কঠিন নয়। মরুভূমির বালি সূর্য্যের তাপে এমন গরম হয় যে, তাহাতে পা দেওয়া যায় না। কাজেই, সেই বালির উপরকার বাতাসের স্তর গরম ও প্রসারিত হইয়া পাত্‌লা হইযা পড়ে। কিন্তু তাহার উপরের স্তর-গুলির বাতাস সে-রকম হয় না;—সেগুলি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও গাঢ় থাকে।

F 7

ামাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কিন্তু মরুভূমির বাতাসে
হারি ঠিক্ উল্‌টা দেখা যায়। সেখানে ঠিক্ মাটির উপরকার
তাস পাত্‌লা এবং উঁচু জায়গার বাতাস গাঢ়। কেন ইহা হয়,
া কঠিন নয়। মরুভূমির বালি সূর্য্যের তাপে এমন গরম হয়
, তাহাতে পা দেওয়া যায় না। কাজেই, সেই বালির
পরকার বাতাসের স্তর গরম ও প্রসারিত হইয়া পাত্‌লা হইয়া
ড়। কিন্তু তাহার উপরের স্তরগুলির বাতাস সে-রকম হয়
;—সেগুলি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও গাঢ় থাকে।

ইহার পরের দুইখানি ছবিতে মরুভূমির বায়ুস্তরের চিত্র
াঁকিয়া দিয়াছি। ইহার নীচের স্তরের বাতাস পাতলা এবং
পরের বাতাস ক্রমে গাঢ়। বায়ুস্তরে আলোর রশ্মি কি-রকমে
াঁকিয়া নীচে নামে এবং পূর্ণ-প্রতিফলনের পরে তাহাই কি-রকমে
পরে উঠে ৯৯ পৃষ্ঠার চিত্রে তাহা আঁকা আছে। ১০০ পৃষ্ঠার
বিখানি দেখ, সেখানে যে-গাছটি আঁকা আছে, তাহার উপর
ইতে যেন একটা আলোর রশ্মি বাহির হইয়া তপ্ত বাতাসের
ভতর দিয়া চলিতেছে। কিন্তু মরুভূমির বাতাসের গাঢ়তা সব
ায়গায় সমান নয়। উপরকার স্তরের বাতাস গাঢ় এবং নীচেকার
রের বাতাস পাত্‌লা। কাজেই, এখানে রশ্মিটি যখন গাঢ়
াতাস হইতে পাত্‌লা বাতাসে আসিবে, তখন তাহার বিবর্ত্তন
টিবে। অর্থাৎ তাহা মুখ বাঁকাইয়া চলিবে। কোন্ দিকে মুখ
াঁকাইবে। নীচের দিকেই বাঁকাইবে,—কারণ উপরের বাতাস
াঢ় এবং নীচের বাতাস পাত্‌লা। কি-রকমে রশ্মিটি বাঁকিয়া

আসিয়াছে তাহা তোমরা ছবিখানি দেখিলেই বুঝিবে। দেখ, এই রকমে বাঁকিয়া আসিতে আসিতে নীচেকার একটা স্তরে আলোক-রশ্মিটির চরম-বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং তাহার পরেই উহা পূর্ণ-প্রতিফলিত হইয়াছে। অর্থাৎ আয়নায় আলো পড়িলে তাহা যেমন ঠিক্‌রাইয়া উপরে উঠে এখানে যেন সেই রকমে উপরে উঠিয়াছে।
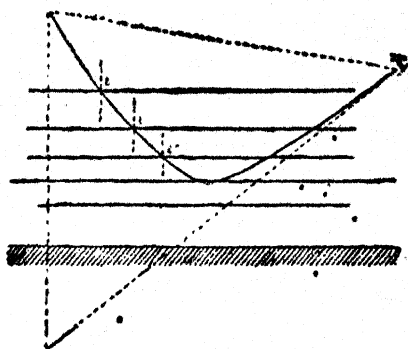
কাজেই, ইহার পরে রশ্মিটি আর নীচে নামিতে পারিবে না,—হেলিয়া উপর দিকে চলিবে এবং দূরে উটের পিঠে যে পথিকটি আছে, তাহার চোখে ঠেকিবে। এখন পথিক সেই আলোর রশ্মিটিকে কোথায় দেখিবে বলিতে পার কি? তোমরা আগেই শুনিয়াছ, কোনো জিনিষের আলো যে-পথে আসিয়া চোখে পড়ে, আমরা সেই পথেরই পিছনে জিনিষটাকে দেখি। কাজেই, এখানে যে-পথে রশ্মি চোখে ঠেকিতেছে তাহারি পিছনে সেই খেজুর গাছের মাথাটা দেখা যাইবে। অর্থাৎ জলে যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায়, এখানে সেই রকমে নীচেকার "ক" বিন্দুতে

গাছের প্রতিবিম্ব নজরে পড়িবে। মরুভূমির পথিকেরা ইহা দেখিয়াই গাছের নীচে জলাশয় আছে মনে করে এবং দুপুর রৌদ্রে আগুনের মতো তপ্ত বালির উপরে ছুটাছুটি করিয়া মারা যায়। দেখ, কি ভয়ানক দৃষ্টিবিভ্রম !
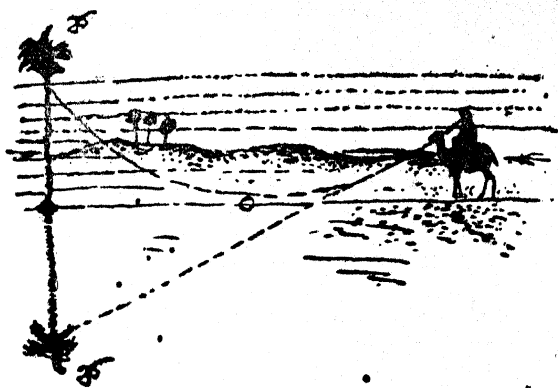
চৈত্র-বৈশাখের দুপুর বেলায় যখন চারিদিকে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে, তখন তোমরা দূরের মাঠের দিকে তাকাইয়া দেখিয়াছ কি ? তাকাইলে মনে হয়, দূরের ছোটো গাছপালা ও ঝোপ-জঙ্গল যেন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। ইহাও দৃষ্টিবিভ্রম। এই সময়ে রৌদ্রের তাপে মাটির উপরকার বাতাসের গাঢ়তা একই রকম থাকে না। তাহা ক্ষণে ক্ষণে বদলাইয়া কখনো গাঢ় বা কখনো পাত্‌লা হয়। ইহাতে দূরের জিনিষের আলোক-রশ্মি ক্ষণে ক্ষণে নানা রকমে বিবর্ত্তিত হইয়া চোখে পড়ে। তাই সেই সকল জিনিষকে আমরা একই জায়গায় দেখিতে পাই না। এখন সেগুলিকে [জা]য়গায় দেখিলাম, পরক্ষণেই তাহাদিগকে একটু এদিকে বা

ওদিকে দেখিতে থাকি। ইহাতে রৌদ্রে দূরের জিনিষকে কাঁপিতে দেখা যায়। দূরের জিনিষের এই রকম কাঁপুনি যে কেবল রৌদ্রের তাপেই হয়, তাহা নয়। রান্নাঘরে কয়লার উনুন গন্‌গন্‌ করিয়া জ্বলিতেছে এবং উনুনের পিছনে কতকগুলি বাসন আছে। এই অবস্থায় যদি তোমরা উনুনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাসনগুলিকে নজর কর, তবে সেগুলিকে স্পষ্ট কাঁপিতে দেখিবে। উনুনের তাপে তাহার কাছের বাতাসের গাঢ়তা ঘন ঘন পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়াই ইহা ঘটে।

নক্ষত্রগুলি আকাশে থাকিয়া কি-রকম মিটিমিটি আলো দেয়, তাহা বোধ করি তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ। প্রদীপের শিখায় বাতাস লাগিলে তাহা যেমন হেলিয়া দুলিয়া আলো দেয়, নক্ষত্রগুলি যেন সেই রকম চঞ্চল হইয়া জ্বলিতে থাকে। তোমরা যদি পরীক্ষা কর তবে দেখিবে, সেগুলি যেন বামে-দক্ষিণে উপরে-নীচে প্রায় এক ইঞ্চি করিয়া সরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাও এক-রকম দৃষ্টিবিভ্রম। পথের মাঝে নক্ষত্রদের আলোর যে বিবর্ত্তন হয়, তাহাতেই ইহা ঘটে। আকাশের নীচের বায়ুস্তর উপরের বায়ুর চাপে যত গাঢ় থাকে, উপরের স্তরগুলি সে-রকম গাঢ় থাকে না। তার উপরে আবার পৃথিবীর উপরকার বাতাস অসমান তাপ পাইয়া কখনো গাঢ় এবং কখনো পাত্‌লা হয়। কাজেই, নক্ষত্রদের আলোর রেখা যখন এই বায়ুস্তরগুলি ভেদ করিয়া নীচে নামে, তখন সোজা পথে আসিতে পারে না। তা' ছাড়া বাতাসের গাঢ়তা-অনুসারে কখনো এপথে কখনো ওপথে চলিয়া চোখে পড়ে। কাজেই, ইহাতে নক্ষত্রদিগকে চঞ্চল দেখায়।

পরকলা

পরকলা (Lens) কাহাকে বলে তোমরা বোধ হয় জানো না। আতসী কাচ (Magnifying glass) এক রকম পরকলা; চশমার কাচও পরকলা। কোনো স্বচ্ছ জিনিষের এক পিঠ বা দুই পিঠ যখন ন্যুব্জ বা কুব্জ হয়, তখন তাহাকে পরকলা বলা যায়। বরফ স্বচ্ছ জিনিষ। সুতরাং বরফের টুক্‌রাকে যদি আতসা কাচের আকারে কাটা যায়, তবে তাহা পরকলার কাজ করে। বোতলে যে জল রাখা যায়, তাহার পিঠ কুব্জ থাকে সুতরাং বোতলের জলকেও পরকলা বলা চলে। পাতার ডগায় শরৎকালে যে-শিশিরের বিন্দু ঝুলিতে থাকে তাহাও পরকলা।

পরপৃষ্ঠায় ছয় রকম পরকলার ছবি দিলাম। দেখ, ক, খ, এবং গ এই তিনখানির মাঝখানটা পাশের চেয়ে পুরু। তাই এ-গুলিকে কুব্জপৃষ্ঠ পরকলা এবং ঘ, ঙ, চ এই তিনখানির মাঝ-খানটা নীচু, তাই এ-গুলিকে ন্যুব্জপৃষ্ঠ পরকলা বলা হয়।

এ-সব পরকলায় আলোর রশ্মি পড়িলে দুইবার বিবর্ত্তিত হয়,—একবার তাহাতে প্রবেশ করার সময়ে আর একবার বাহির হইবার সময়ে। ইহাতে অবস্থা-বিশেষে ছোটো জিনিষকে

বড় এবং দূরের জিনিষকে কাছে দেখায়। তা'ছাড়া পরকলা দিয়া কোনো জিনিষকে দেখিলে অবস্থাবিশেষে সেটিকে কখনো পিছনে হটিতে বা সম্মুখে এগাইতেও দেখা যায়। অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, ম্যাজিক লণ্ঠন, ফোটোগ্রাফের ক্যামেরা প্রভৃতি অনেক যন্ত্রতে কাচের পরকলা ব্যবহার করা হয়। পরকলার গুণেই এই সব যন্ত্রের কাজ দেখিয়া আমরা অবাক্ হই। তোমাদিগকে একে-একে কুব্জপৃষ্ঠ (convex) এবং ন্যুব্জপৃষ্ঠ (concave) পরকলার কতকগুলি প্রধান গুণের কথা বলিব।
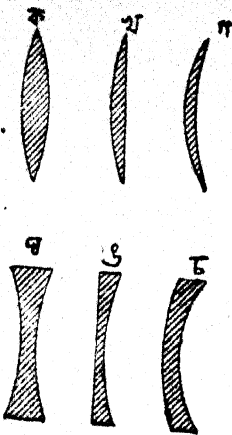
এই বিষয়গুলি বুঝিতে হইলে কয়েকটি কথা তোমাদের মনে রাখিতে হইবে। পরপৃষ্ঠায় একটা কুব্জপৃষ্ঠ পরকলার ছবি দিলাম। "ক" এবং "খ" বিন্দুদুইটি যেন উহার দুই পিঠের Centres of Curvature বক্রতার কেন্দ্র। "ক" ও "খ" বিন্দু দুইটিকে যোগ করিলে যে-রেখা পাওয়া যায় তাহাকে বলা হয় প্রধান-মধ্যরেখা (Principal axis)। পরকলা মাত্রেরই এই রকম এক-একটি মধ্যরেখা আছে। পরকলার ভিতরকার "চ" জায়গাটাকে বলা হয় মধ্যবিন্দু (optical centre)। ইহা থাকে সাধারণতঃ পরকলার দুই পিঠের ঠিক্ মাঝে। মধ্যরেখা

এই মধ্যবিন্দু ভেদ করিয়া চলে। এখন মধ্যবিন্দুর ভিতর দিয়া যদি "প চ ফ" এর মতো যে-কোনো রেখা টানা যায়, তাহাকে বলা হয় সাধারণ-মধ্যরেখা (secondary axis)। সুতরাং দেখ, সাধারণ-মধ্যরেখা এবং প্রধান মধ্যরেখার মধ্যে তফাৎ অনেক। প্রধান-মধ্যরেখা যায় বক্রতার কেন্দ্র ও মধ্যবিন্দু দিয়া ;
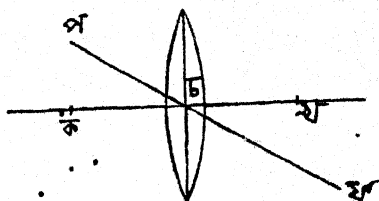
সাধারণ মধ্যরেখা যায় কেবল মধ্যবিন্দু ভেদ করিয়া। তাহা হইলে দেখ, প্রত্যেক পরকলায় একটিমাত্র প্রধান-মধ্যরেখা থাকে, কিন্তু সাধারণ-মধ্যরেখা থাকে অসংখ্য ; কারণ মধ্যবিন্দু "চ" এর ভিতর দিয়া যে-কোনো রেখা টানিলে, তাহা সাধারণ-মধ্যরেখা হইয়া দাঁড়ায়। আমরা কেবল কুব্জপৃষ্ঠ পরকলার ছবি আঁকিয়া তাহার মধ্যরেখা দেখাইলাম। ন্যুব্জপৃষ্ঠ পরকলাতেও ঐরকম সাধারণ ও প্রধান-মধ্যরেখা আছে। তোমরা তাহা আঁকিয়া দেখিয়ো।

কুব্জপৃষ্ঠ পরকলা

আলোর রশ্মি সাধারণতঃ দুই রকমে চলা-ফেরা করে। মোমবাতি বা সাধারণ প্রদীপের আলোর রশ্মি কি-রকমে চলে, তোমরা সকলেই তাহা দেখিয়াছ। শিখা হইতে বাহির হইয়া তাহা উপর-নীচে আশে-পাশে সব দিকেই ছড়াইয়া যায়। এই রশ্মিকে বলা হয় বহির্মুখ (Divergent) রশ্মি। বহির্মুখ রশ্মি ক্রমেই পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়ে। সূর্য্য হইতে যে-রশ্মি পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, তাহা গোড়ায় এক জায়গা হইতে বাহির হইয়া আসে। সুতরাং ইহাও বহির্মুখ। কিন্তু অনেক দূর হইতে আসে বলিয়া সূর্য্যের রশ্মিগুলিতে সমান্তরালই (parallel) ধরা হয়। ষ্টীমারের সার্চ-লাইট্ বাইসিকেল ও মোটর গাড়ীর ল্যাম্প হইতে যে-আলো বাহির হইয়া ছুটিয়া চলে, সেগুলির রশ্মিও সমান্তরাল।

যাহা হউক, সমান্তরাল ও বহির্মুখ রশ্মি কুব্জপৃষ্ঠ পরকলায় পড়িয়া যে-সব কাজ দেখায়, তোমাদিগকে একে একে তাহা বলিব। কুব্জপৃষ্ঠ পরকলা তোমরা হাতের গোড়ায় অনেক পাইবে। বুড়ো মানুষের চশমার এবং আতসী কাচের মাঝখানটা কিনারার চেয়ে মোটা। সুতরাং এগুলি কুব্জপৃষ্ঠ পরকলা। চশমা বা আতসী কাচ লইয়া তোমরা পরীক্ষা করিয়ো।

ছবিতে দেখ, একখানি কুব্জপৃষ্ঠ পরকলা রহিয়াছে এবং

কতকগুলি সমান্তরাল আলোর রশ্মি প্রধান-মধ্য-রেখার সহিত সমান্তরাল-ভাবে তাহার এক পিঠে ঠেকিয়াছে। ছবি দেখিলেই
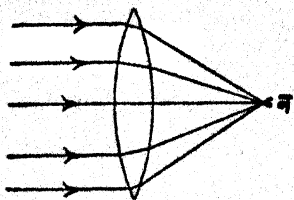
বুঝিবে, রশ্মিগুলি যে-মুখে আসিতেছিল বিবর্ত্তনের ফলে সে-মুখ ছাড়িয়া অন্য মুখে চলিতেছে এবং পরকলার ওপিঠে আসিয়া "ন" বিন্দুতে সকলে মিলিত হইয়াছে। এই বিন্দুটিকে বলা হয় পরকলার প্রধান-অধিশ্রয় (Principal focus)। ইহা প্রত্যেক পরকলাতেই তাহার প্রধান-মধ্যরেখার উপরকার একটা নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে থাকে। পরকলার মাঝখানটা কিনারার চেয়ে যতই মোটা হয়, এই প্রধান-অধিশ্রয় ততই পরকলার কাছে ঘেঁসিয়া আসে। দুপুর বেলায় যখন সূর্য্যের আলো ঠিক্ লম্বভাবে মাটিতে আসিয়া পড়িবে, তখন তোমরা একখানা আতসী কাচ বা চশমা লইয়া পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে, সূর্য্যের যে-সব রশ্মি পরকলার উপরে পড়িতেছে, সেগুলি সত্যই বাঁকিয়া তাহার তলাকার এক বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। একখানা সাদা কাগজ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে, সে-জায়গাটা এত উজ্জ্বল হইয়াছে যে, তাকাইলে চোখ ঝলসাইয়া যায় এবং একটু বেশিক্ষণ রাখিলে কাগজখানি জ্বলিয়া উঠে। সূর্য্যের তাপ ও আলোর যে-রশ্মিগুলি পরকলায় পড়ে, সেগুলি একটুখানি ছোটো জায়গায় একত্র হয় বলিয়া সেখানে এত আলো এবং এত তাপ।

এখন মনে কর, কতকগুলি বহির্মুখ রশ্মি যেন পরকলায় আসিয়া পড়িয়াছে। বিবর্ত্তনের পরে ইহার অবস্থা কি-রকম হয়, তাহা নিয়ে একটি ছবিতে আঁকিয়া দিলাম। দেখ, ইহাতে যে "প ক" ও "প খ" দুইটি বহির্মুখ রশ্মি আঁকা আছে, সেগুলি পরকলায় বিবর্ত্তিত হইয়া প্রধান-মধ্যরেখার "ফ" বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। ইহাও এক প্রকার অধিশ্রয়। কিন্তু প্রধান-অধিশ্রয় নয়। ইহাকে বলা হয় সম্বন্ধী-অধিশ্রয় (Conjugate focus) পরকলামাত্রেরই প্রধান-অধিশ্রয়ের দূরত্ব নির্দ্দিষ্ট থাকে। কিন্তু
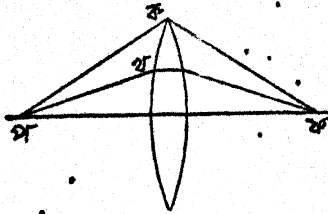
সম্বন্ধী-অধিশ্রয়ের দূরত্ব স্থির থাকে না। আলো'কে যতই পরকলার কাছে আনা যায় তাহার বহির্মুখ রশ্মির সম্বন্ধী-অধিশ্রয় ততই দূরে যায়। আবার আলো'কে যতই দূরে লওয়া যায়, ততই সেই অধিশ্রয় পরকলার কাছে আসে। কিন্তু ইহারো একটা সীমা আছে। মনে করা যাউক, ছবির আলো "প" পরকলার কাছে আসিতে আসিতে প্রধান অধিশ্রয়ের জায়গায় আসিয়া পৌঁছিল। এই অবস্থায় আলোর রশ্মিগুলি বিবর্ত্তিত হইয়া কোথায় যাইবে, তোমরা বোধ হয় জানো না। তখন সেগুলি

পরকলা ভেদ করিয়া আসিয়া অনেক দূরে অধিশ্রয় রচনা করিবে। ইহাতে বিবর্ত্তিত রশ্মিগুলি প্রায় সমান্তরাল হইয়া দাঁড়াইবে। আবার মনে কর, আলো'কে পরকলা হইতে যেন খুব দূরে লওয়া হইল। এই অবস্থায় আলোর বহির্মুখ রশ্মি ঠিক্ সমান্তরাল রশ্মির মতো কাজ করিবে। তখন সেগুলিকে তোমরা প্রধান-অধিশ্রয়ে একত্র হইতে দেখিবে।

এখন মনে কর, আলোটিকে যেন প্রধান-অধিশ্রয় এবং পরকলার মাঝামাঝি কোনো জায়গায় রাখা হইয়াছে। বিবর্ত্তনের পরে এই অবস্থায় আলো আরো ছড়াইয়া পড়িবে, কাজেই ওপিঠে গিয়া সেগুলি অধিশ্রয় উৎপন্ন করিতে পারিবে না। এই রকমে বিবর্ত্তিত আলো যখন চোখে আসিয়া পড়ে, তখন মনে হয় যেন রশ্মিগুলি আলোর পিছনে একটা জায়গায় একত্র হইয়াছে। তোমরা আগে সমতল আয়নার প্রতিফলনে মিথ্যা প্রতিবিম্বের কথা শুনিয়াছ। এই প্রতিবিম্বকে কাগজের উপরে বা পর্দ্দার উপরে ফেলা যায় না। ইহাও চোখের ভুল বা মায়া ছবি। কোনো আলো'কে প্রধান অধিশ্রয় ও পরকলার মাঝে রাখিলে আলোর পিছনে যে-সম্বন্ধী অধিশ্রয় হয়, তাহাও ঐ-রকম মিথ্যা ব্যাপার। এই অধিশ্রয়ের অস্তিত্ব নাই, যখন বিবর্ত্তিত রশ্মি চোখে আসিয়া ঠেকে, তখন সেগুলিকে ঐ অধিশ্রয়ে একত্র দেখা যায় মাত্র। কাগজে বা পর্দ্দার উপরে তোমরা ঐ অধিশ্রয়কে ফেলিতে পারিবে না।

কুব্জপৃষ্ঠ পরকলার প্রতিবিম্ব

ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়নায় সত্য ও মিথ্যা দুই রকমেরই প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। ইহা তোমরা আগেই দেখিয়াছ। কুব্জপৃষ্ঠ পরকলাতেও ঠিক তাহাই দেখা যায়। পরকলার সম্মুখে কোনো জিনিষ রাখিলে তাহার আলো বিবর্ত্তিত হইয়া কখনো সত্য এবং কখনো মিথ্যা প্রতিবিম্ব রচনা করে। আমরা এই প্রতিবিম্বকে কখনো উল্‌টা এবং কখনো সোজা দেখিতে পাই।
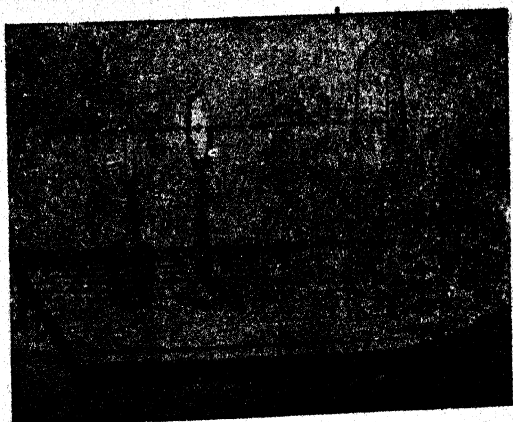
এখানে যে-ছবিটি দিলাম দেখ। একখানি কুব্জপৃষ্ঠ পরকলার সম্মুখে বাতি জ্বলিতেছে এবং তাহার ওপিঠে একটা গোলাকার পর্দ্দা রহিয়াছে। দেখ, বাতির একটা উল্‌টা কিন্তু

বড় প্রতিবিম্ব পর্দ্দায় পড়িয়াছে। কি-রকমে ইহা উৎপন্ন হইল আলোর রশ্মির পথ আঁকিলেই তাহা বুঝিবে। শিখার উপরকার অংশে রশ্মিগুলি বিবর্ত্তিত হইয়া পর্দ্দার নীচে পড়িয়াছে। তাই প্রতিবিম্বকে উল্‌টা দেখাইতেছে।

কিন্তু তাই বলিয়া সব প্রতিবিম্বই এই রকম বড় হয় না। পরকলার প্রধান-অধিশ্রয়ের কাছে যে-জিনিষ থাকে, তাহারি
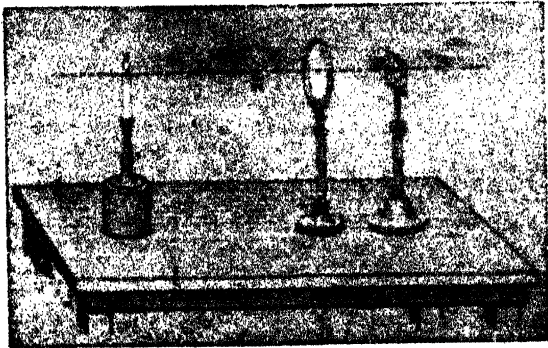
প্রতিবিম্ব বড় হয়। এখানকার ছবিখানি লক্ষ্য কর। দেখ, ছবির বাতিটি প্রধান-অধিশ্রয় "ন" হইতে অনেক দূরে আছে। তাই প্রতিবিম্ব বড় হয় নাই—ইহা আসল বাতির চেয়ে অনেক ছোটো হইয়াছে। আবার ১০৯ পৃষ্ঠার ছবিখানি লক্ষ্য কর। সেখানে বাতিটিকে প্রধান অধিশ্রয় "ন" বিন্দুর খুব কাছে আনা হইয়াছে, তাই সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবিম্বটিও বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সব প্রতিবিম্বই উল্‌টা।

সুতরাং এই পরীক্ষাগুলি দ্বারা জানা গেল, কুব্জপৃষ্ঠ পরকলায় দূরের জিনিষের ছোটো ও উল্‌টা প্রতিবিম্ব পর্দ্দার উপরে পড়ে। তার পরে জিনিষটাকে যতই পরকলার কাছে আনা যায়, ততই পর্দ্দার উপরে তাহার বড় প্রতিবিম্ব পড়িতে আরম্ভ করে। কিন্তু সব প্রতিবিম্বই উল্‌টা থাকে। এগুলি সত্য প্রতিবিম্ব, তাই কাগজের উপরে বা পর্দ্দার উপরে উহাদিগকে ফেলা যায়।

একখানি আতসী কাচ বা বুড়োদের চশমার পরকলা কাছে পাইলে পরীক্ষা করিয়ো. দেখিবে, যে-কথাগুলি বলিলাম তাহা সত্য। দিনের বেলায় দরজা জানালা বন্ধ করিয়া তোমাদের পড়ার ঘরে একটা মোমবাতি জ্বালিয়া পরীক্ষা করা চলিবে। আলোর কাছে পরকলা রাখিলে বাতির একটা উল্‌টা এবং বড় প্রতিবিম্ব ও-পিঠের কাগজে পড়িবে এবং পরকলাখানিকে দূরে লইয়া গেলে সেই প্রতিবিম্বই ছোটো হইতে থাকিবে। অন্ধকার ঘরের জানালার ছোটো ফাঁক দিয়া যে-আলো ঘরে আসে সেখানে আতসী কাচ ধরিলেও তোমরা ঐগুলি দেখিতে পাইবে। কাচের পিছনে একখানি সাদা কাগজ ধরিয়ো, দেখিবে বাহিরের গাছপালা ঘর-বাড়ির একটা সুন্দর উল্‌টা ছবি কাগজে পড়িয়াছে।

কুব্জ-পৃষ্ঠ পরকলার সত্য প্রতিবিম্বের কথা বলা হইল। কোন্ অবস্থায় ইহাতে মিথ্যা প্রতিবিম্ব হয়, এখন তাহারি কথা তোমাদিগকে বলিব। পর-পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। দেখ, একটা লোক একখানা কুব্জপৃষ্ঠ পরকলাকে চোখের সম্মুখে ধরিয়া "ক খ" চিহ্নিত একটা জিনিষকে দেখিতেছে। জিনিষটি আছে

পরকলার খুব কাছে, অর্থাৎ প্রধান-অধিশ্রয় ও কাচের মাঝে কোনো জায়গায়। ঐ ছবিতে দেখ, জিনিষটির আলোর রশ্মি বিবর্ত্তিত হইয়া ও-পিঠে মিলিত হয় নাই। তাই সেই রশ্মিতে লোকটা "ক খ" জিনিষের একটা সোজা এবং খুব বড় প্রতিবিম্ব এ-পিঠেই "ক' খ'" জায়গায় দেখিতেছে। কিন্তু মনে রাখিয়ো, ইহা সত্য প্রতিবিম্ব নয়। যে-জায়গায় বড় প্রতিবিম্বটা দেখা যাইতেছে, সেখানে কাগজ বা পর্দ্দা রাখিলে তাহাতে ছবি পড়ে না। সুতরাং ঐ প্রতিবিম্ব একটা চোখের ভুল মাত্র।
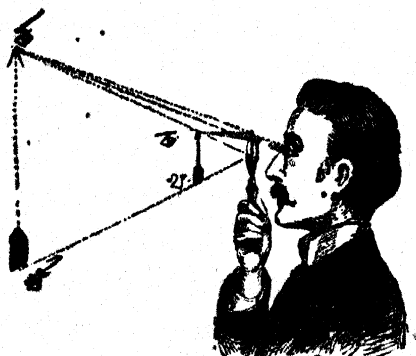
বইয়ের পাতার উপরে আতসী কাচ রাখিয়ো বই পড়িতে গেলে হরফগুলিকে কত বড় দেখায়, তাহা বোধ করি তোমরা দেখিয়াছ। বইয়ের পাতা থাকে, প্রধান-অধিশ্রয় ও পরকলার মাঝে, তাই পাতার অক্ষরগুলির বড় প্রতিবিম্ব চোখে পড়ে।

সুতরাং এই প্রতিবিম্বও মিথ্যা এবং দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র। বুড়োরা খালি-চোখে বই পড়িতে পারেন না। কিন্তু চোখে চশমা দিলেই বইয়ের অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট হইয়া নজরে পড়ে। বুড়োদের চশমার কাচ এক রকম কুব্জপৃষ্ঠ পরকলা। ইহার প্রধান-অধিশ্রয় থাকে বইয়ের পাতার বাহিরে। তাই চশমা নাকে দিলেই অক্ষরগুলিকে বড় দেখায়। এসম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদিগকে পরে বলিব।

ন্যুব্জপৃষ্ঠ পরকলা

ন্যুব্জপৃষ্ঠ পরকলা কাহাকে বলে তোমরা তাহা আগেই শুনিয়াছ। যে-সব পরকলার মাঝখানটা নীচু এবং কিনারা উঁচু থাকে সেগুলিকেই ন্যুব্জপৃষ্ঠ পরকলা বলা হয়। তোমাদের মধ্যে কাহারো কাহারো হয় ত চোখ খারাপ। ভালো করিয়া দেখিবার জন্য তোমাদের চশমা ব্যবহার করিতে হয়। ছেলেরা বা যুবকেরা যে-চশমা ব্যবহার করেন, তাহা তোমরা পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, এগুলির মাঝখানটা কিনারার চেয়ে নীচু। এই রকম কাচকেই ন্যুব্জপৃষ্ঠ পরকলা (Concave lens) বলা হয়।

এখানে ন্যুব্জপৃষ্ঠ পরকলার একটা ছবি দিলাম। দেখ
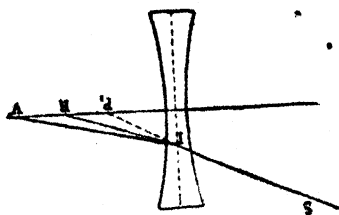
পরকলার দুই পিঠই নীচু। 'v' জায়গা হইতে একটা আলোর রশ্মি বাহির হইয়া পরকলার "L S" পথে বিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু পরকলার বাহিরে আসিয়া একত্র হইতে পারিতেছে না।

কাজেই এই রশ্মির অধিশ্রয় হয় না। বিবর্ত্তিত রশ্মি চোখে পড়িলে যে জিনিষ হইতে আলো বাহির হইতেছে, তাহাকে ছোটো আকারে সেই জিনিসটারই সম্মুখে দেখা যায়। নীচের
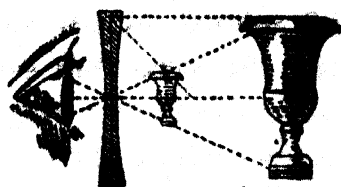
ছবিখানি দেখ। ন্যুব্জপৃষ্ঠ পরকলায় একটা বড় ফুলদানিকে যে কত ছোটো দেখায় তাহা আঁকা আছে। ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়নায় এই যে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহা সোজা হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা সত্য নয়। ইহাকে কখনই কাগজে বা পর্দ্দার উপরে ফেলা যায় না।

তে-শিরা পরকলা

তোমরা পলকাটা কাচ বা তে-শিরা পরকলা (Prism) নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। হয় ত এখন মনে পড়িতেছে না। ঝাড় লণ্ঠন দেয়ালগিরি প্রভৃতিতে এই রকম পরকলা অনেক ঝুলানো থাকে। রাত্রিতে বাতির আলোতে সেগুলি ঝক্‌মক্‌ করে। কেবল ইহাই নয়, সেগুলিতে আলো পড়িলে রামধনুর রঙের মতো লাল হলুদ সবুজ বেগুনে প্রভৃতি নানা রঙিন আলো দেখা যায়। তোমরা ইহা দেখ নাই কি ? পূজার সময় যখন ঠাকুর-দালানে ঝাড় ঝুলানো হইবে, তখন নজর করিলে তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। আমরা যখন তোমাদের মতো ছোটো ছিলাম, তখন ক্রিয়াকর্ম্মে বাড়িতে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলানো হইত। সেই সময়ে এক টুক্‌রা ভাঙা পরকলার জন্য মিস্ত্রিদের যে কত খোষামদ করিয়াছি, তাহা আজো মনে আছে। তখন একখানা ভাঙা পরকলা হাতে পাইলে আহার-নিদ্রা বন্ধ হইয়া যাইত। চোখে লাগাইয়া তাহা দিয়া বাড়ি-ঘর গাছপালা দেখিয়া লইতাম। সব জিনিসেরই কিনারায় যেন রামধনুর রঙের পাড় লাগানো দেখা যাইত। সে কি আনন্দ! পলকাটা কাচ বা তে-শিরা পরকলা দিয়া রামধনুর রঙ কেন দেখা যায়, সেই কথা তোমাদিগকে বলিব।

পরপৃষ্ঠায় একখানি তে-শিরা কাচের ছবি দিলাম। এই

এক টুকরা কাচ দিয়া আলো-সম্বন্ধে যে-সব খবর জানা গিয়াছে, তাহা আশ্চর্য্যজনক। তে-শিরা পরকলায় আলো পড়িলে কি-রকমে তাহার বিবর্ত্তন হয়, প্রথমে তাহাই দেখা যাউক।

এই পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ছবিখানি লক্ষ্য কর। দেখ, নীচেকার বাতি হইতে আলোর রশ্মি আসিয়া পরকলায় প্রবেশের সময় একবার বিবর্ত্তিত হইয়া কাচে প্রবেশ করিয়াছে এবং পরে কাচ হইতে বাহির হইবার সময়েও উহাকে আর একবার বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই দুইবারের বাঁকা আলো চোখে আসিয়া পড়ায় বাতিটিকে একটু উঁচু জায়গায় দেখাইতেছে। তোমরা যে-কোনো তে-শিরা কাচ লইয়া পরীক্ষা করিলে ইহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে।
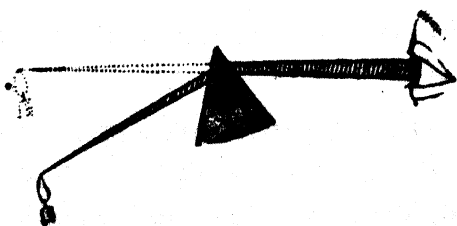
বৈশাখের বিকালে ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, কেবল পূর্ব্বদিকে খুব দূরে বৃষ্টি হইতেছে। এমন

সময়ে পশ্চিম দিক্ হইতে সূর্য্যের কিরণ বৃষ্টির জলবিন্দুর উপরে পড়িলে কি হয় তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। তখন পূর্ব্ব আকাশে সুন্দর রামধনুর উদয় হয়। রামধনুতে যে-সকল রঙ্ সাজানো থাকে, সেগুলির মত সুন্দর রঙ্ আর কোথাও দেখা যায় না। উপর দিকে থাকে সুন্দর লাল রঙ্ তা'র নীচে অরুণ, হলুদ, সবুজ, আশমান, নীল ও বেগুনে প্রভৃতি নানা রঙ পরে-পরে থাকে-থাকে সাজানো দেখা যায়। তোমরা বোধ হয় মনে কর এই সাতটি রঙ লইয়াই বুঝি রামধনুর উৎপত্তি। কিন্তু তাহা নয়। লক্ষ্য করিলে দেখিবে রামধনুতে হাজার হাজার রঙ্ আছে। লালের পরে হঠাৎ অরুণ রঙ্ আসে না। এই দুয়ের মধ্যে লাল ও হলুদের যে কত রকম রেশ থাকে, তাহা গুণিয়াই শেষ করা যায় না। সেই রকম হলুদ, সবুজ, আশমান নীল এবং নীল-বেগুনের মধ্যেও রঙের অনেক রেশ পাওয়া যায়। সুতরাং রামধনুকের রঙ্‌কে সাত-রঙা বলা যায় না। হাজার-রঙা বা লক্ষ-রঙা বলিলেও বেশি কিছু বলা হয় না। এই সব রঙের নাম অভিধানেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই রামধনুর রঙ্‌কে মোটামুটি সাত রকমে ভাগ করা হয়।

তোমরা ছেলেবেলা হইতেই রামধনুর রঙ্ দেখিয়া আসিতেছ, কিন্তু এই রঙ্ কোথা হইতে আসে তোমরা খোঁজ করিয়াছ কি? একখানা কাপড় রঙ করিতে হইলে আমরা বাজার হইতে রঙ্ কিনিয়া কত আয়োজনে তাহাকে রঙিন করি। আকাশে বৃষ্টির ধারা ও সূর্য্যের কিরণ ছাড়া আর কিছুই নাই। তবে কোথা

হইতে ঐ রঙ আসে ? ইহার উত্তরে বৈজ্ঞানিকেরা যাহা বলেন, তাহা বড় আশ্চর্য্য। তাঁহারা বলেন, আমরা সূর্য্যের আলোর এই যে সাদা রশ্মি দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে লাল, অরুণ, হলুদ, সবুজ প্রভৃতি সাতটা প্রধান রঙের রশ্মি মিশানো আছে। এই সাত রঙের সাতটি রশ্মি যখন এক সঙ্গে গোছা বাঁধিয়া আমাদের চোখে পড়ে, তখন আমরা একত্রে সাদা রঙ দেখি। কিন্তু সেই সাত রঙের রশ্মিগুচ্ছ যখন বৃষ্টির জল-বিন্দুতে আসিয়া ঠেকে, তখন সেখানে বিবর্ত্তিত হইয়া তাহাই সেই সাত রঙে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। তাই সূর্য্যের সাদা আলোর ভিতরকার এই সাতটা রঙই পৃথক্ হইয়া আমাদিগকে রামধনু দেখায়।

তে-শিরা পরকলায় যখন সূর্য্যের আলো পড়ে, তখন সেখানেও উহা ঘটে। সূর্য্যের সাদা আলো ঝাড়ের বা দেওয়াল-গিরির কলমে প্রবেশ করিয়া বাহিরে আসিবার সময়ে তাহার সেই সাতটা মূল রঙে পৃথক্ হইয়া পড়ে। তাই সাধারণ সাদা আলো তে-শিরা কাচ হইতে বাহির হইয়া যখন দেওয়ালের গায়ে পড়ে, তখন আমরা তাহাতে রামধনুর মতো সাতটা রঙ সাজানো দেখিতে পাই। তাহা হইলে দেখ, সূর্য্যের আলো'কে সাদা দেখাইলেও, তাহা সাদা নয়। উহাতে লাল, অরুণ, হলুদ, সবুজ, আশমান, নীল এবং বেগুনে এই সাতটি মূল রঙের আলো মিশানো থাকে। এই আলোগুলি একত্র চোখে আসিয়া ঠেকে বলিয়াই, আমরা সেগুলিকে সাদা দেখি।

কি-রকমে তে-শিরা কাচে সূর্য্যের আলো বিশ্লিষ্ট হয়, এখন

সেই কথা তোমাদিগকে বলিব। এখানে একটা ছবি দিলাম। সাধারণ আলো কি-রকমে কাচে বিশ্লিষ্ট হইতেছে ছবিতে আঁকা আছে। দেখ, বিশ্লিষ্ট আলো দেওয়ালের গায়ে "চ ছ" জায়গায় পড়িয়াছে। তোমরা অন্ধকার ঘরের দরজা বা জানালার ছোট ছিদ্র দিয়া সূর্য্যের আলো ঘরে আনিয়ো এবং তা'র পরে সেই আলোর
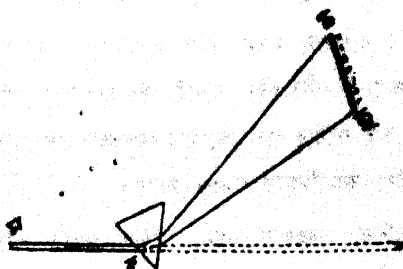
পথে একখানা তে-শিরা কাচ ধরিয়ো। ইহাতে সাধারণ সাদা সূর্য্যের আলো'কে ঐরকমেই বিশ্লিষ্ট হইতে দেখিবে। এই বিশ্লিষ্ট রঙিন আলো'কে বলা হয় বর্ণচ্ছত্র (Spectrum)।

সাধারণ পরকলায় সূর্য্যের আলো পড়িলে সাধারণতঃ তাহার সব রঙকে পৃথক্ দেখা যায় না, কিন্তু তে-শিরা কাচের ভিতর দিয়া আসিলেই সেই সাদা আলোই ভাঙিয়া কেন রঙিন হইয়া পড়ে সে-সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে জানা গিয়াছে, সূর্য্যের সাদা আলোতে যে-সব রঙিন আলোর রশ্মি মিশানো আছে, সেগুলি তে-শিরা কাচের ভিতর দিয়া আসিবার সময়ে সমানভাবে বিবর্ত্তিত হয় না। অর্থাৎ কতকগুলি রশ্মি

বেশি বাঁকিয়া বাহিরে আসে এবং কতকগুলি তাহার তুলনায় কম বাঁকিয়া বাহির হয়। সব চেয়ে বেশি বাঁকে বেগুনে রশ্মি এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম বাঁকে লাল রশ্মি। ইহাতে যে-সব রশ্মি এক সঙ্গে চলিয়া সাদা আলো দেখাইতেছিল, এখন পৃথক্ হইয়া পড়ায় সাদা আলো দেখাইতে পারে না। কাজেই সাদা আলোর ভিতরকার রঙিন আলোগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

তোমরা মনে রাখিয়ো, ত্রে-শিরা কাচে সূর্য্যের সাদা আলো বিবর্ত্তিত হইয়া যে-সব রঙ্ দেখায়, সেগুলি বিশুদ্ধ অর্থাৎ খাঁটি রঙ্। খাঁটি রঙ্ পাওয়া বড় কঠিন। অপরাজিতা ফুলের রঙ্ নীল, আবার আতসী ফুলের রঙ হল্‌দে। এই নীল ও হল্‌দেকে খাঁটি রঙ্ বলা যায় না। ত্রে-শিরা কাচের ভিতর দিয়া ঐ রঙের আলোর রশ্মিগুলিকে আনিলে হয় ত দেখিবে, সেগুলি নানা বিশুদ্ধ রঙে ভাগ হইয়া পড়িতেছে। কোনো রঙিন আলোর বিশুদ্ধি পরীক্ষার ইহাই এক-মাত্র উপায়। সূর্য্যের আলোর বর্ণচ্ছত্রে যে লাল, অরুণ, হলুদ প্রভৃতি রঙ্ থাকে সেগুলি বিশুদ্ধ রঙ্। তাই ত্রে-শিরা কাচের ভিতর দিয়া পরীক্ষা করিলে সেগুলির কোনোটিকেই নূতন রঙে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখা যায় না। সাধারণ আতস বাজির লাল বা সবুজ আলো'কে তোমরা যদি ত্রে-শিরা কাচে ফেলিয়া পরীক্ষা কর, তবে তবে তাহাদিগকে নানা রঙে বিভক্ত হইতে দেখিবে। কাজেই বলিতে হয়, বর্ণচ্ছত্রের লাল বা সবুজের মতো এই সব কৃত্রিম ও রঙিন আলো কখনই বিশুদ্ধ নয়।

জলে চিনি গুলিলে চিনির সরবৎ তৈয়ারী হয়। ইহাতে

যে জল ও চিনি ছাড়া আর কিছুই থাকে না, তাহা দুই রকমে প্রমাণ করা যায়। সরবৎকে কোনো পাত্রে ফুটাইলে জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, পাত্রে অবশিষ্ট থাকে কেবল চিনি। ইহা দেখিয়া বলা যাইতে পারে, সরৎ জল ও চিনি দিয়া প্রস্তুত। আবার চোখের সম্মুখে খানিকটা জলের সঙ্গে চিনি মিশাইয়া খাইলেও বলা যায়, সরবৎ জল ও চিনি দিয়া প্রস্তুত। অর্থাৎ কোনো জিনিসকে ভাঙিয়া তাহার উপাদান দেখানো চলে; আবার সেই জিনিসকে চোখের সম্মুখে গড়িয়াও তাহার উপাদান ঠিক করা যায়। সূর্য্যের সাধারণ সাদা আলো'কে ভাঙিলে কি-রকমে রঙিন বিশুদ্ধ আলো পাওয়া যায়, তোমরা তাহা দেখিলে। সূর্য্যের সাদা আলো যে, লাল, অরুণ, হলুদ, প্রভৃতি সাতটি মূল আলো দিয়া প্রস্তুত, ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা ইহাতেই সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহারা সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রের সেই সাতটা রঙিন মূল আলোকে মিশাইয়াও সাদা আলো প্রস্তুত করিয়াছেন।

পরপৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। দেখ, সূর্য্যের আলো একখানা তে-শিরা কাচের ভিতর দিয়া আসিয়া রঙিন বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিয়াছে। তা'র পরে আবার সেই রঙিন আলোগুলিকে একখানা ন্যুব্জপৃষ্ঠ আয়নায় ফেলিয়া "ন" বিন্দুতে একত্র করা হইয়াছে। এই পরীক্ষায় "ন" বিন্দুতে আর বর্ণচ্ছত্রের সেই সাতটা রঙ দেখা যাইবে না,—সাতটা রঙে মিলিয়া "ন" বিন্দুতে একটা সাদা আলোর উৎপত্তি করিবে। সুতরাং সূর্য্যের সাধারণ

আলো যে, সাতটা রঙিন আলো দিয়া প্রস্তুত এই পরীক্ষা দেখিলে তাহাতে একটুও সন্দেহ থাকে না।

আর একটা পরীক্ষার কথা বলি। পরপৃষ্ঠার ছবিতে দেখ,
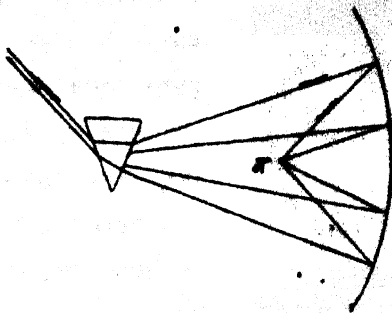
সেখানে একটা গোলাকার পেষ্ট-বোর্ড আঁকা আছে। ইহাতে বর্ণচ্ছত্রের লাল, অরুণ, হলুদ, সবুজ, ইত্যাদি সাত রঙের কাগজ আঁটা রহিয়াছে। এখন যদি এই রঙিন্ চাকতিখানিকে খুব জোরে চোখের সম্মুখে ঘুরানো যায়, তাহা হইলে উহাকে আর রঙিন দেখায় না,—মনে হয় যেন উহা কোনো সাদাটে কাগজে মোড়া আছে। কেন এ-রকম দেখায়, বলা কঠিন নয়। তোমরা বোধ করি লক্ষ্য করিয়াছ, যখন আমরা কোনো উজ্জ্বল জিনিসের দিকে তাকাইয়া চোখ বুজি, তখন চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটা চোখ হইতে লোপ পায় না। অর্থাৎ চোখ বোজার পরে অতি অল্পক্ষণের জন্য তাহাকে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোর দিকে বা সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া তোমরা চোখ

বুজিয়া এই পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, চোখ বোজার পরেও বিদ্যুতের বাতি বা সূর্য্যের মূর্ত্তি যেন চোখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। উজ্জ্বল আলো আমাদের চোখে যে-আঘাত দেয়, তাহার ফল বেশি
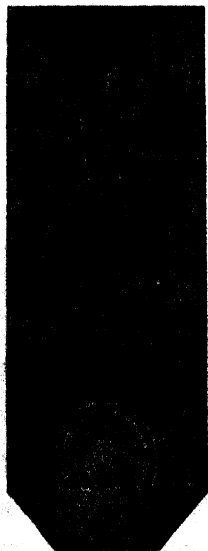
ক্ষণ স্থায়ী হয় বলিয়াই ইহা ঘটে। আমাদের চোখের এই-রকম দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদিগকে পরে বলিব। যাহা হউক, এখানে রঙিন চাক্‌তিটিকে যেমন ঘুরানো যায়, অমনি তাহার লাল, হলদে, সবুজ, নীল ইত্যাদি উজ্জ্বল রঙ্ অতি অল্পক্ষণের জন্য একে একে চোখে আসিয়া পড়িলেও, চোখের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার জন্য সবগুলিকেই আমরা একত্র দেখিতে আরম্ভ করি। কাজেই রঙিন আলোগুলিকে মিশাইলে যে-ফল হয়, আমাদের চোখের দেখাতে অবিকল তাহাই ঘটে,—অর্থাৎ সাতটা রঙের বদলে আমরা কেবল সাদা রঙ্ দেখিতে থাকি। সুতরাং সাতটা মূল রঙে যে, সূর্য্যের সাদা আলো উৎপন্ন হয়, তাহা এই পরীক্ষাতেও জানা যায়।

রঙ্

আকাশের রঙ্ নীল। গাছপালা এবং ঘাসের রঙ্ সবুজ। দেখিলে যেন চোখ জুড়াইয়া যায়। সিঁদুরের রঙ্ টক্‌টকে লাল। বেশিক্ষণ তাকাইলে যেন চোখ ঝল্‌সাইয়া যায়। তা'ছাড়া পাখীর পালকে, প্রজাপতির ডানায়, মেঘে-মেঘে, ফুলে-ফলে যে কত রঙ্ দেখা যায়, তাহা গুণিয়া শেষ করা যায় না। এই রঙ্‌গুলিই পৃথিবীকে মনোরম করিয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক, এই রঙ্‌গুলি কি-রকমে উৎপন্ন হয়, এখন তোমাদিগকে সেই কথা বলিব।

তোমাদের লাল জামা এবং লাল বইগুলিকে দিনের বেলায় লাল দেখায়। কিন্তু রাত্রি আসিলে যখন সকলি অন্ধকারে ডুবিয়া যায়, তখন সেগুলিকে লাল দেখায় কি? কখনই দেখায় না। কেবল লাল রঙ্‌কেই যে অন্ধকারে দেখা যায় না, তাহা নয়। হলদে সবুজ নীল প্রভৃতি রঙের জিনিসের রঙ্‌কেও অন্ধকারে চেনা যায় না। হলদে লাল গোলাপী নীল প্রভৃতি ফুলের যত বাহার দিনে, রাত্রির অন্ধকারে সেগুলিতে একটুও রঙের বাহার থাকে না। তখন গাছপালা, ঘরবাড়ী, মাঠঘাট সকলকেই কালো দেখায়। ইহা হইতে বুঝা যায়, সূর্য্যের আলোর সঙ্গে রঙের একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

মনে কর, তোমার টক্‌টকে লাল জামাটিকে রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে। কি সুন্দর রঙ্‌ ঠিক্‌ যেন জবাফুলের রঙের মতো টক্‌টক্‌ করিতেছে। কেন লাল জামাকে লাল দেখায় এসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা যাহা বলেন, তাহা বড় মজার। তাঁহারা বলেন, সূর্য্যের সাধারণ আলোতে যে, লাল অরুণ হলুদ সবুজ আশ্‌মান নীল এবং বেগুনে রঙ্‌ মিশানো আছে, সেই সব রঙের লাল রঙে জামাকে লাল দেখায়। তোমরা হয় তো বলিবে, তাহা হইলে সূর্য্যের আলোর অন্য রঙগুলি কোথায় যায়? ইহার উত্তরে বৈজ্ঞানিকেরা যাহা বলেন, তাহা আরো মজার। তাঁহারা বলেন যে-জিনিসকে আমরা লাল দেখি, তাহার একটি বিশেষ গুণ এই যে, সূর্য্যের সাদা রঙের ভিতরকার সাতটা রঙের মধ্যে প্রায় সবগুলিকেই তাহা চুষিয়া লয়. কেবল লাল রঙটাকে চুষিতে পারে না। তাই ইহাই যখন ঠিক্‌রাইয়া আমাদের চোখে পড়ে, তখন জিনিসটাকে আমরা লাল দেখি। কেবল লাল রঙেই যে, ইহা ঘটে তাহা নয়। যখন লতা-পাতাকে সবুজ দেখায় হলুদে-ছোপানো কাপড়কে হলদে বলিয়া বোধ হয়, গিরিমাটি লাগানো কাপড়কে পাটল দেখায় এবং নীলবড়ীকে নীল বলিয়া বোধ হয়, তখনো ইহা ঘটে। লতা-পাতায় যখন সূর্য্যের আলো পড়ে, তখন পাতাগুলি সূর্য্যের আলোর সব রকম রঙ্‌কে গ্রাস করিয়া ফেলে; গ্রাস করিতে পারে না কেবল সবুজ রঙ্‌কে। তাই সেই আলো পাতা হইতে ঠিক্‌রাইয়া চোখে আসিলে আমরা পাতাকে সবুজ দেখি। ছোবানো হলদে কাপড়েও তাহাই ঘটে। এক

হলুদ ছাড়া সূর্য্যালোকের সব রঙকেই হলদে কাপড়ে চুরি করিয়া লয়। কাজেই সূর্য্যের সেই সাতটা রঙের মধ্যে কেবল হলদে রঙটাই আমাদের চোখে ঠেকে। সূর্য্যালোকের হলুদ সবুজ নীল প্রভৃতি কতকগুলি রঙকে গিরিমাটি চুরি করিয়া লয়, বাকি যে-গুলি প্রতিফলিত হইয়া চোখে পড়ে, তাহাদের মধ্যে লালের ভাগটাই থাকে বেশি। তাই গিরিমাটিতে ছোপানো কাপড়কে লালচে দেখায়। তাহা হইলে দেখা গেল, সূর্য্যের সাধারণ কিরণে যে সাত রকম প্রধান রশ্মি মিশানো থাকে, তাহাই আমাদের চারিদিকের জিনিসকে রঙিন করে।

রঙ সম্বন্ধে যে-কথাগুলি বলা হইল, তাহা যে সত্যই নানা পরীক্ষায় প্রমাণ করা যায়। মনে কর, তে-শিরা কাচে সূর্য্যের আলো'কে বিশ্লিষ্ট করিয়া আমরা দেওয়ালের গায়ে একটা সাত-রঙা বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিলাম। তাহাতে লাল, অরুণ, হলুদ প্রভৃতি সাতটি প্রধান রঙ এবং আরো অনেক রঙ থাকে থাকে সাজানো রহিল। এখন যদি একটা লাল ফুল লইয়া তোমরা বর্ণচ্ছত্রের লাল অংশে ধরিতে পার, তবে দেখিবে, ফুলের লাল রঙ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। কেন ইহা ঘটে বোধ হয় এখন তোমরা নিজেরাই বলিতে পারিবে। লাল ফুলটির গুণ এই যে, তাহা লাল ছাড়া অন্য সব রঙকেই গ্রাস করিয়া ফেলে। তাই বর্ণচ্ছত্রের বিশুদ্ধ লাল আলোর সমস্তটাই তাহা হইতে প্রতিফলিত হইয়া চোখে পড়িল। ইহাতেই ফুলের রঙ উজ্জ্বল লাল দেখাইল। কিন্তু সেই ফুলকেই বর্ণচ্ছত্রের সবুজ আলোতে ধরিয়া পরীক্ষা

করিলে তাহার সুন্দর লাল রঙ্ আর চোখে পড়িবে না। তখন ফুলটিকে দেখাইবে কালো। কেন ইহা ঘটে বলা কঠিন নয়। লাল ফুল কেবল লাল রঙ্কেই প্রতিফলিত করিতে পারে, তা'ছাড়া অন্য সব রঙ্কে গ্রাস করে। বর্ণচ্ছত্রের সবুজ অংশে লাল রঙ্ নাই, তাই লাল ফুলে সবুজ আলো ফেলিলে লাল প্রতিফলিত হয় না, উপরন্তু যে সবুজ রঙ গায়ে ঠেকে সেটুকুকে তাহা গ্রাস করিয়া ফেলে। কাজেই, লাল ফুলটিকে কালো দেখায়। নানা রঙের কাপড় বা কাগজ লইয়া বর্ণচ্ছত্রের রঙিন আলোতে এই রকম পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে, রঙ্ সম্বন্ধে আগে যে-কথা বলিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

দিনের আলোতে রঙিন জিনিসকে যেমন সুন্দর ও উজ্জ্বল দেখায়, রাত্রির প্রদীপের আলোতে সে রকম দেখায় না। হলুদে ছোপানো বাসন্তী রঙের কাপড়কে রাত্রিতে একরকম সাদা বলিয়াই বোধ হয়। হলুদ দিয়া খিচুড়ি বা তরকারী রাঁধিয়া রাত্রিতে প্রদীপের আলোতে খাইতে বসিলে হলুদের রঙ্ চোখে পড়ে না। খুব পাকা রাঁধুনিও রাত্রিতে তরকারীর রঙ্ ফলাইতে পারেন না। তোমরা এইগুলি লক্ষ্য কর নাই কি? এই সকল বর্ণবিভ্রাটের কারণ তোমরা এখন সহজেই বুঝিতে পারিবে। সূর্য্যের আলোতে যে-সব রঙিন রশ্মি আছে, প্রদীপের সাধারণ আলোতে তাহার সকলগুলি সমান পরিমাণে থাকে না। তাই কোনো জিনিস সূর্য্যালোকে যে-সব রঙ্ প্রতিফলিত করে, প্রদীপের আলোতে সেই সকল রঙ্ প্রতিফলিত করিতে পারে না। ইহাতেই

রাত্রিতে প্রদীপের আলোতে কোনো জিনিসের আসল রঙ্ ধরা যায় না। তোমাদের মধ্যে হয় ত কেহ রঙ্ দিয়া ছবি আঁকিতে পার। যাঁহারা পাকা চিত্রকর তাঁহারা কখনই রাত্রিতে রঙিন ছবি আঁকেন না। প্রদীপের আলোতে রঙ্ চেনা যায় না। কাজেই, রাত্রিতে যে-সব রঙিন্ ছবি আঁকা যায়, দিনের আলোতে সেগুলিকে কিম্ভুত-কিমাকার দেখায়। তা'ছাড়া চিত্রকররা রাত্রিতে রঙিন্ ছবি দেখিতেও নিষেধ করেন। কারণ, ছবির কোথায় কোন্ রঙটি আছে, প্রদীপের আলোতে তাহা বুঝা যায় না। কাজেই, ভালো ছবির বর্ণযোজনা তখন নজরেই পড়ে না। ইহাতে লোকে ভালো ছবিকে মন্দ বলিয়া মনে করে। ঘরে রঙিন্ ছবি টাঙাইবার সময়ে দিনের বেলায় যে দেওয়ালে বাহিরের আলো বেশি পড়ে, সেখানে ছবি টাঙাইতে হয়। সূর্য্যের আলোই রঙগুলিকে ফুটাইয়া ছবির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। ঘরের অন্ধকার কোণে তোমরা কখনই ভালো রঙিন ছবি টাঙাইয়ো না।

তোমাদের কাহারো কাহারো বাড়ির দরজা-জানালায় হয় ত রঙিন্ কাচ লাগানো আছে। এই সকল কাচের ভিতর দিয়া যে-রৌদ্র ঘরে আসিয়া পড়ে, তাহাও রঙিন্ হইয়া দাঁড়ায়। গির্জ্জার জানালার সার্সিতে লাল, নীল, সবুজ, হলুদ প্রভৃতি নানা রঙের কাচের টুকরা লাগানো থাকে। সূর্য্যের আলো এই সব কাচের ভিতর দিয়া ঘরে আসিলে বড় সুন্দর দেখায়। তখন মনে হয়, ঘরের মেজেতে কে যেন নানা রঙ্ দিয়া আল্পনা আঁকিয়া

দিয়াছে। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? একটুকুরা লাল বা নীল কাচ পাইলে ছেলেবেলায় যে কত খুসী হইতাম, তাহা আজো মনে আছে। এই কাচ চোখে দিলে বাহিরের ঘর-বাড়ী রাস্তা-ঘাট সব জিনিসকেই রঙিন্ দেখাইত। রঙিন্ কাচের ভিতর দিয়া সূর্য্যের কিরণ আসিলে তাহা কেন রঙিন্ হয়, এখন সেই কথাটা তোমাদিগকে বলিব।

এসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা যাহা বলেন, তাহা বড় মজার। তাঁহারা বলেন, জেলেদের জাল যেমন মাছ ধরার ফাঁদ, রঙিন্ কাচগুলি তেমনি আলো ধরার ফাঁদ। পুষ্করিণীতে জাল ফেলিলে সব মাছ ধরা পড়ে না। চুনা পুঁটি প্রভৃতি ছোটো মাছগুলি জালের ফাঁক দিয়া পালাইয়া বাহিরে আসে, ধরা পড়ে কেবল বড় বড় রুই-কাত্‌লা। লাল, নীল বা অন্য রঙিন্ কাচের ভিতর দিয়া যখন সূর্য্যের আলো আসে, তখন তাহাতেও কতকটা সেই রকম ব্যাপার হয়। সূর্য্যের সাধারণ আলোতে যে সাতটা রঙিন্ আলো মিশানো আছে, তাহাদের কতকগুলি রুই-কাত্‌লা মাছের মতো কাচে আট্‌কাইয়া নষ্ট হয়, বাহিরে আসে কেবল বাকি রঙিন্ আলোগুলি। ইহাতেই আলো রঙিন্ হইয়া দাঁড়ায়। বোধ করি, তোমরা কথাটা বুঝিলে না। একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে কর, তোমাদের বাড়ীর জানালার সার্সিতে যেন লাল কাচ লাগানো আছে এবং সূর্য্যের সাদা আলো কাচের ভিতর দিয়া আসিয়া লাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লাল কাচের স্বধর্ম্মই এই যে, তাহা সাদা আলোর সাতটা রঙিন্ রশ্মির মধ্যে কেবল

লাল রশ্মিকেই বাহিরে আসিতে দেয়, বাকি হল্‌দে, সবুজ, নীল, বেগুনে ইত্যাদি রশ্মিগুলিকে আট্‌কাইয়া গ্রাস করে। কাজেই, লাল কাচ হইতে সাদা আলো লাল হইয়া বাহিরে আসে। আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। মনে কর, একখানি সবুজ কাচের ভিতর দিয়া সাদা আলো সবুজ হইয়া বাহির হইতেছে। কেমন করিয়া সাদা আলো সবুজ হইল বলা যায় না কি? সবুজ কাচের স্বধর্ম্মই এই যে, তাহা লাল হলুদ নীল বেগুনে প্রভৃতি রশ্মিগুলিকে আট্‌কাইয়া গ্রাস করিতে পারে, কিন্তু সবুজ রঙ্‌কে হজম করিতে পারে না। ইহাতেই সাত-রঙা রশ্মির মধ্যে কেবল সবুজ রশ্মিই অবাধে কাচের বাহিরে আসিয়া পড়ে।

এই কথাগুলি যে সত্য একটা সহজ পরীক্ষায় প্রমাণ করা যায়। সকালে বা বিকালে যখন জানালার ফাঁক দিয়া ঘরে রৌদ্র আসিবে, তখন তোমরা সেই রৌদ্রে একখানি লাল কাচ ধরিয়ো। লাল কাচের ভিতর দিয়া রৌদ্র লাল হইয়া বাহিরে আসিবে। এখন, এই লাল রৌদ্রের পথে তোমরা যদি একখানি সবুজ কাচ ধরিতে পার, তাহা হইলে লাল রৌদ্রকে কখনই সবুজ কাচের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিতে দেখিবে না। লাল ছাড়া সব রঙ্‌কেই লাল কাচ গ্রাস করে, আবার সবুজ কাচ সবুজ ছাড়া সব রঙ্‌কেই আট্‌কাইয়া ফেলে। কাজেই, লাল কাচের লাল রঙ্ সবুজ কাচে প্রবেশ করিয়া বাধা পাইয়া যায়,—ইহা আর বাহিরে আসিতে পারে না। তোমরা লাল ও সবুজ কাচের টুক্‌রা লইয়া এই সহজ পরীক্ষাটি করিয়ো।

কাচ সম্বন্ধে যে-কথা বলা হইল, জল, বাতাস প্রভৃতি অপর স্বচ্ছ পদার্থ সম্বন্ধেও ঠিক্ সেই কথা বলা চলে। দীঘির গভীর জলের রঙ গাঢ় সবুজ, কিন্তু হাঁটু জল বা এক হাত গভীর জলের কোনো রঙই বুঝা যায় না। সুতরাং বলিতে হয়, জল স্বচ্ছ হইলেও সূর্য্যের আলোর সেই সাত-রঙা রশ্মির সবগুলি অবাধে তাহার ভিতর দিয়া আসিতে পারে না। গভীর জলের তলা হইতে যে-আলো উপরে আসে, তাহার লাল হল্‌দে প্রভৃতি রশ্মি আট্‌কাইয়া যায়, তাই কেবল সবুজ নীল প্রভৃতি রঙের রশ্মিতে জলকে কালো দেখায়।

রঙিন জিনিসকে কেন রঙিন দেখায় এবং স্বচ্ছ রঙিন জিনিসের ভিতর দিয়া সাদা আলো আসিলে তাহা কেন রঙিন হইয়া পড়ে, তাহা জানা গেল। এখন সাদা ও কালো রঙ্ সম্বন্ধে তোমাদিগকে কয়েকটি কথা বলিব। একটু পরিষ্কার জল বাটিতে রাখিলে বা একটু বাতাস শিশিতে পুরিলে, তাহাদের কোনো রঙ্ দেখা যায় কি? এগুলির বিশেষ কোনো রঙ্ নাই। সূর্য্যের সাধারণ আলো, অগভীর জল, বা অল্প বাতাসের ভিতর দিয়া বিনা বাধায় চলিয়া আসে। তাই সেগুলিতে কোনো রঙ্ দেখা যায় না। অগভীর জল ও বাতাস বর্ণহীন,—সাদা নয়। তবে সাদা কাহাকে বলিব? এই বইয়ের পাতাখানি সাদা, তোমার পরণের কাপড়খানি সাদা, খড়িমাটি ও চূণ সাদা, বুড়ো মানুষের মাথার চুলও সাদা। এই সাদা রঙ্ কেমন করিয়া হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। আমরা যে-সব জিনিসকে সাদা বলি,

তাহাতে সূর্য্যের আলো পড়িলে তাহার সাত রঙা রশ্মির সবগুলিই প্রতিফলিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, কোনো রশ্মিই নষ্ট হয় না। তাই জিনিসগুলিকে সাদা দেখায়। অর্থাৎ সাদা রঙের জিনিসগুলি চুরি বিদ্যা জানে না। এইজন্য যে-আলো তাহার উপরে পড়ে তাহার সকলি সে প্রতিফলিত করিতে পারে। সাদা কাগজের উপরে লাল নীল সবুজ যে-কোনো আলো ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে, তাহা কোনো আলো'কেই চুরি করিতে পারিতেছে না। তাই লাল আলোতে কাগজখানিকে লাল এবং নীল আলোতে নীল দেখায়।

আমরা যে-সব জিনিসকে কালো বলি, তাহাদের কাজ কিন্তু ইহারি উল্‌টা। কালো জিনিসগুলা যেন এক-একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস। ইহার উপরে যে-আলো ফেলা যায়, তাহাকে ইহা অম্লানবদনে গ্রাস করিয়া ফেলে। কোনো রঙে বা কোনো আলোতে ইহার অরুচি নাই। তাই কালো জিনিসে লাল, নীল, সবুজ যে-কোনো আলো ফেলিলে তাহা কালোই থাকিয়া যায়— তাহা হইতে কোনো রঙের কোনো রশ্মিই প্রতিফলিত হয় না। কাজেই বলিতে হয়, রঙের অভাবই কালো। তোমরা হয়ত বলিবে, এই যে কালো মলাটের বইখানা টেবিলের উপরে রহিয়াছে, তাহাকে দেখা যাইতেছে কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, আমরা কালো বইখানার চারিপাশের জিনিসপত্র দেখিতে পাই, যেখানটাকে দেখিতে পাই না; সেটাই অন্ধকার অর্থাৎ কালো বই। সাদা কাগজের উপরে কালো কালিতে

লিখিলেও ইহা ঘটে। কালো অক্ষরের আশ-পাশের সাদা কাগজকে আমরা দেখিতে পাই, দেখিতে পাইনা কেবল সেখানটা—যেখানে কালির আঁচড় কাটা আছে। কাজেই, দেখার মধ্যে না দেখাই স্পষ্ট হইয়া পড়ে। এই জন্যই সাদার মাঝে কালোকে ভালো মানায়।

আমরা ঘরের ভিতরে কেন চূণের সাদা গোলা লাগাই, তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। সাদা জিনিস সব রকম আলোর রশ্মিকে প্রতিফলিত করে। তাই চূণকাম-করা ঘরে দিনের আলো প্রবেশ করিলে বা একটা বাতি জ্বালিলে, সাদা দেওয়াল হইতে সমস্ত আলো প্রতিফলিত হইয়া ঘরটিকে আলোকিত করে। কিন্তু যে-ঘরের দেওয়ালে আল্‌কাতরা বা অন্য কোনো কালো রঙ্ মাখানো থাকে সেখানে ইহা ঘটে না। এই রকম ঘরে আলো জ্বালিলে, তাহার প্রায় ষোল আনা আলোই কালো দেওয়ালে গ্রাস করিয়া ফেলে। কাজেই, হাজারটা বাতি জ্বালিলেও ঘরে আলো খেলে না।

আমরা সাদা ও কালো দুই রকম কাপড়েরই ছাতা ব্যবহার করি। রৌদ্রে কোন রকম কাপড়ের ছাতা ব্যবহার করা ভালো তোমরা বলিতে পার কি? সাদা ছাতার উপরে সূর্য্যের যে-তাপ ও আলো পড়ে তাহার অধিকাংশই প্রতিফলিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া যায়। কাজেই, এই রকম ছাতা মাথায় দিলে তাহার তলায় তাপ প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাতে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। কিন্তু কালো ছাতায় ইহারি ঠিক্ উল্‌টা ব্যাপার দেখা যায়। এই

রকম ছাতার উপরে সূর্য্যের যত তাপ ও আলো পড়ে তাহার সকলি কালো কাপড়ে চুষিয়া লয়। ইহাতে ছাতার তলা গরম হইয়া মাথাকে গরম করে। কালো জামাতেও ঐ দোষ দেখা যায়। কালো জামা তাপ ও আলো চুষিয়া শরীরকে গরম রাখে সুতরাং শীতকালে কালো জামা গায়ে দিলে আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে সে জামায় আরাম পাওয়া যায় না,—গায়ে দিলে গলদ্-ঘর্ম্ম হইতে হয়। দরজা-জানালায় পর্দ্দা টাঙাইয়া ঘরকে অন্ধকার করিতে গেলে কি-রকম রঙের পর্দ্দা ব্যবহার করা উচিত, তাহা বোধ করি তোমরা নিজেরাই বলিতে পারিবে। সাদা পর্দ্দায় আলো প্রতিফলিত করে; কালো পর্দ্দা সব আলোই চুষিয়া লয়। সুতরাং ঘর অন্ধকার করার জন্য কালো পর্দ্দা ব্যবহার করাই ভালো।

মেঘের ও আকাশের রঙ

সূর্য্যাস্তে ও সূর্য্যোদয়ে আকাশে কি-রকম রঙের বাহার হয়, তাহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। তখন আকাশের লাল, গোলাপী, হল্‌দে প্রভৃতি রঙের যেন হোলি খেলা দেখা যায় ;— রামধনুর সাতটা রঙ্ যেন তখন মেঘে মেঘে খেলা করিয়া বেড়ায়। শরৎকালের নীল আকাশে যে তূলার স্তূপের মতো মেঘ দেখা যায়, সেগুলির কথা মনে করিয়া দেখ। দেখিলেই মনে হয়, কে যেন এই মেঘগুলার মাথায় রূপার পাত মুড়িয়া দিয়াছে। আবার আষাঢ়ের নূতন মেঘের কথা স্মরণ কর। তাহাতে রঙের বাহার থাকে না বটে, কিন্তু দেখিলেই যেন চোখ জুড়াইয়া যায়। তখন ক্ষণে ক্ষণে কাজল-রঙের মেঘ আকাশের কোণে জমা হয়। তার পরে তাহা আকাশে ছড়াইয়া পড়িলেই হুড় হুড় করিয়া বৃষ্টি হয়। মেঘের এই যে বিচিত্র রঙ্ কোথা হইতে আসে, তাহা বোধ করি তোমরা জানো না। সূর্য্যের সাধারণ আলোতে যে সাত রঙের রশ্মি থাকে তাহাই এই সব রঙের খেলা দেখায়।

যাহা হউক, আকাশে ও মেঘে এই রকম নানা রঙ্ কি-রকমে উৎপন্ন হয়, তাহা বুঝিতে গেলে কয়েকটি সাধারণ জিনিসের রঙের কথা মনে করিতে হইবে। রেলের গাড়ি বা কোন কলের চিম্‌নি হইতে যে ধোঁয়া উঠে, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। মনে কর, কোনো কলের চিম্‌নি হইতে যে-ধোঁয়া উঠিতেছে, তাহাতে

যেন রৌদ্র পড়িতেছে এবং তুমি সূর্য্যকে পিছনে রাখিয়া যেন ধোঁয়ার দিকে তাকাইয়া আছ। এই অবস্থায় ধোঁয়ার রঙ্ কি-রকম হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা লক্ষ্য কর নাই। পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে, ধোঁয়ার রঙ্ নীল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যখন আমরা সূর্য্যকে সামনে রাখিয়া সেই ধোঁয়ারই দিকে তাকাই, তখন তাহাকে আর সে-রকম নীল দেখায় না,—তখন তাহার রঙ্ হইয়া দাঁড়ায় কতকটা যেন তামার মতো লাল্‌চে। আবার যখন ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া রেলের এন্‌জিন ষ্টীম ছাড়িতে আরম্ভ করে, তখন ষ্টীমের রঙ্ হয় ফুটফুটে সাদা। কেন ধোঁয়ার রঙ্ কখনো নীল ও কখনো লাল্‌চে হয় এবং কেনই বা ষ্টীমের রঙ্ সাদা হয়, তাহা বোধ করি তোমরা সকলে জানো না। এগুলি জানা দরকার। তোমরা ধোঁয়াকে কি মনে কর জানি না। তোমাদের হয়ত মনে হয় ইহা বাতাসের মতো একরকম বাষ্প। কিন্তু তাহা নয়। ধোঁয়া জিনিসটাতে খুব ছোটো ছোটো কয়লার কণা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। এইজন্যই যে-ঘরে সর্ব্বদা ধোঁয়া আসে, তাহার দেওয়াল ও ছাদ ধোঁয়ার ভিতরকার কয়লার কণায় কালো হইয়া যায়। আবার নাকে ধোঁয়া গেলে নাক হইতে কয়লার কালি বাহির হয়। এন্‌জিন্ হইতে যে-ষ্টীম বাহির হয়, তাহা ধোঁয়া নয়, সেগুলি জলের কণা কিন্তু আকারে ধোঁয়ার কয়লার কণার চেয়ে অনেক বড়। সূর্য্যের সাদা রশ্মি তাহার সাত-রঙা আলোর ঢেউ লইয়া যখন এই ধোঁয়া ও ষ্টীমের কণায় আসিয়া পড়ে, তখন সেই ঢেউগুলির কতক ঐ কণাগুলিতে ঠেকিয়া

দেখ নাই কি? শরৎকালে প্রতিদিনই সূর্য্যের উদয়াস্তের সময়ে আকাশে এই রকম রঙের মহোৎসব দেখা যায়। ইহার কারণ জানিতে গেলে কয়েকটি কথা তোমাদের মনে রাখিতে হইবে। মনে রাখিয়ো, এই জলস্থলময় পৃথিবীর চারিদিকেই একটা গভীর বায়ুর আবরণ আছে এবং সেই বায়ুমণ্ডলে আবার অসংখ্য ধূলিকণা ভাসিয়া বেড়ায়। সূর্য্যের আলো সকল সময়েই এই বায়ুর ও ধূলির আবরণ ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। কিন্তু বেশি বায়ু ও ধূলি ভেদ করিয়া আসে কখন্? একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে, দুপুরে সূর্য্য যখন মাথার উপরে থাকে, তখন আলো'কে যতটা বাতাস ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আসিতে হয়, বিকাল বেলার সূর্য্যের টের্‌চা আলো'কে তাহার চেয়ে অনেক বেশি বায়ু ভেদ করিয়া আসিতে হয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে, দুপুরের সোজা আলোর চেয়ে বিকালের টের্‌চা আলোই ধূলিকণায় বেশি ধাক্কা পায়। কিন্তু ধূলিকণায় বাধা পাইলে সূর্য্যের আলোর অবস্থা কি হয়, তোমরা তাহা আগেই শুনিয়াছ। তখন তাহার নীল বেগুনে প্রভৃতি আলোর খুব ছোটো ঢেউগুলা ধূলিকণায় ঠিক্‌রাইয়া প্রতিফলিত হয় এবং লাল হলুদ প্রভৃতি বাকি বড় ঢেউগুলি অবাধে বাতাস ও ধূলিকণার ভিতর দিয়া চলিয়া আসে। উদয় ও অস্তের সময়ে সূর্য্যের আলোর অবস্থা ঠিক্ এই রকমই হয়। পথের মাঝে অনেক ধূলিকণায় বাধা পাইয়া সূর্য্যের সাদা আলোর নীল ও বেগুনে প্রভৃতি রঙের ঢেউ ঠিক্‌রাইয়া আকাশের উপর দিকে চলিয়া যায়। সেগুলি আর

পৃথিবীতে নামে না। পৃথিবীতে আসে কেবল লাল অরুণ হলুদ সবুজ প্রভৃতি বড় ঢেউগুলি কাজেই পৃথিবীবাসী আমরা এই সকল ঢেউয়ে আকাশে লাল অরুণ হলুদ প্রভৃতি রঙ্‌ দেখিতে পাই। কেবল ইহাই নয়, এই সকল ঢেউ যাহার উপরে পড়িয়া প্রতিফলিত তাহাকেও ঐ সকল রঙে রাঙাইয়া তোলে। আকাশের মেঘে মেঘে যে-রঙ্‌ দেখা যায়, আশ্বিনের সকালে যে-সোনার আলোতে মাঠ-ঘাট ভরিয়া যায়, তাহাও সেই লাল অরুণ হলদে প্রভৃতি রঙের প্রতিফলন।

বাতাসে বেশি ধূলিকণা থাকিলে সূর্য্যের আলোকে যে, কত লাল দেখায়, তাহা অনেক দিন আগে আমরা একবার স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম। প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে সুমাত্রা দ্বীপের কাছে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল। কেবল ভূমিকম্প নয়, সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে আগুন ছাই ও গলা ধাতু উঠিয়া ক্রাকাতোয়া নামে একটা দ্বীপকে একেবারে ধ্বংস করিয়াছিল। তা'ছাড়া ছাইয়ের কণায় আকাশ এরকম আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, দিন-দুপুরেও লোকে সূর্য্যের আলো দেখিতে পাইত না। ক্রাকাতোয়ার এই ছাইয়ের কণা হইতে পৃথিবীর কোনো দেশ রক্ষা পায় নাই। কয়েক দিনের জন্য পৃথিবীর সমস্ত আকাশ ছাইয়ের কণায় পূর্ণ ছিল। সেই সময়ে কয়েক দিন সকালে-বিকালে আকাশে যে-সুন্দর লাল রঙ্‌ দেখিয়াছিলাম, তাহা আজো মনে আছে। তখন সত্যই মনে হইত, সূর্য্যের চারিদিকে বহু দূর পর্য্যন্ত কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। সে-দৃশ্য জীবনে ভুলিব না।

আকাশের ও মেঘের বিচিত্র রঙের কথা বলা হইল। শরৎকালের মেঘের উজ্জ্বল সাদা রঙ্ এবং আষাঢ়ের নূতন মেঘের চোখ্-জুড়ানো কালো রঙ্ কেমন করিয়া হয়, তাহা এখনো বলা হয় নাই। শরতের হাল্কা মেঘের টুক্রায় যখন সূর্য্যের আলো পড়ে তখন সেই সাদা আলোর সব রকম রশ্মিই মেঘের জলকণায় প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে আসে। এইজন্যই শরতের মেঘকে ফুট্‌ফুটে সাদা দেখায়। কিন্তু ঘন মেঘ যখন সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখে, তখন তাহার রঙ্ হইয়া দাঁড়ায় মিশমিশে কালো। কাল-বৈশাখের বিকালে পশ্চিম আকাশে যে-মেঘ জমে, তাহাকে কত কালো দেখায় তোমরা লক্ষ্য কর নাই কি ? এখানে সূর্য্যের অধিকাংশ আলোই ঘন মেঘের অপর পিঠে প্রতিফলিত হইয়া আকাশের উপর দিকে চলিয়া যায়। কাজেই তাহা পৃথিবীতে নামিয়া আমাদের চোখে পড়ে না। এইজন্যই মেঘগুলিকে গাঢ় কালো দেখায়।

পরিপূরক রঙ

ষোল আনায় এক টাকা হয়। আবার বারো আনা এবং চারি আনাতেও এক টাকা হয়। এক হিসাবে চারি আনাকে বারো আনার পরিপূরক বলা যাইতে পারে। কারণ চারি আনা, বারো আনার সঙ্গে মিশিয়া একটি টাকা সম্পূর্ণ করে। এই রকমে দুই আনাকে চৌদ্দ আনার, তিন আনাকে তেরো আনার এবং পাঁচ আনাকে এগারো আনার পরিপূরক বলা যাইতে পারে। রঙের মধ্যে এই রকমে একটাকে অন্যটার পরিপূরক বলা যায়। সূর্য্যের সাধারণ আলোতে মোটামুটি হিসাবে লাল অরুণ হলুদ সবুজ আশমান নীল ও বেগুনে এই সাতটা রঙ্ মিশানো থাকে। তাই বর্ণচ্ছত্রের এই সাতটা রঙ্‌কে একত্র করিলে সাদা আলো পাওয়া যায়। এখন এই সাতটা রঙের লালকে পৃথক্ রাখিয়া যদি বাকি ছয়টাকে কুব্জপৃষ্ঠ পরকলায় ফেলিয়া একত্র করা যায়, তাহা হইলে কি হয় তোমরা বলিতে পার কি? তখন সেই ছয়টা রঙিন আলোতে সাদা আলো হয় না,—সবুজ ও নীলের মাঝামাঝি একটা আলো পাওয়া যায়। কাজেই যে-সাতটা রঙে আগে সাদা আলো পাওয়া যাইতেছিল, এখন এই রঙটায় ও লালে ঠিক্ সেই সাদা রঙই পাওয়া যাইবে। এই জন্য লাল রঙ্ এবং সবুজের আভাযুক্ত নীল রঙ্ পরস্পর

পরিপূরক বলা হয়। এই রকম পরীক্ষায় বেগুনে ও হলুদ. হলুদ ও নীল, লাল ও সবুজ,—এই জোড়া জোড়া রঙের প্রত্যেকটিকে অপরটির পরিপূরক বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

জ্যোৎস্না রাত্রিতে সাদা কাপড়কে পেত্নী মনে করিয়া যাহারা ভয় পায় এবং পথের পাশের তালগাছকে ভূত মনে করিয়া যাহারা মূর্চ্ছা যায় তেমন লোক আমাদের মধ্যে দু'চার জন আছে। এই সব বিভীষিকা ভয় হইতেই হয়। যাহারা সাহসী তাহারা এই রকম বিভীষিকা দেখে না। ভয়ের বিভীষিকার মতো রঙেরও এক রকম বিভীষিকা আছে। ইহা আমাদের চোখের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা হইতে ঘটে। তোমরা উদয় ও অস্তের সময়কার সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া দেখিয়াছ কি? তখন সূর্য্য-মণ্ডলকে লাল দেখায়। অনেকক্ষণ তাহার দিকে তাকাইলে চোখ টন্ টন্ করে। এই রকমে দুই তিন মিনিট সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া চোখ বুজিলে কি হয়. তোমরা দেখ নাই কি? তখন চোখের ভিতরে ক্ষণে ক্ষণে সূর্য্যের একটি মূর্ত্তি দেখা দিয়া মিলাইয়া যায়। কিন্তু সে-মূর্ত্তিকে লাল দেখায় না,—তাহাতে লালের পরিপূরক সবুজ রঙটাই নজরে পড়ে। কেবল সূর্য্যের দিকে তাকাইলেই যে ইহা দেখা যায়, তাহা নয়। তোমরা যে-কোনো উজ্জ্বল রঙের দিকে তাকাইয়া চোখ বুজিয়ো, সেখানেও তাহার পরিপূরক রঙকে চোখের সম্মুখে ভাসিতে দেখিবে। ইহাকে রঙের বিভীষিকা বলা যায় না কি? তোমরা লাল সূর্য্যকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া চোখ বুজিলে, তাহারি ফলে দেখা গেল, সবুজ

সূর্য্যমণ্ডল। আর একটা বিভীষিকার কথা বলি। সাদা কাগজের উপরে লাল সবুজ হলুদ প্রভৃতি যে-কোনো উজ্জ্বল রঙের একটা বড় বৃত্ত আঁকিয়া তাহার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়ো। দেখিবে, সেই রঙের চারি পাশে যেন তাহারি পরিপূরক রঙের একটা মণ্ডল দেখা যাইতেছে। যে-রঙ্ নাই, এই পরীক্ষায় সেই রঙ্ দেখা গেল। সুতরাং ইহাও এক রকম বিভীষিকা। মনে রাখিয়ো, আমাদের চোখের স্বাভাবিক দোষে এই সব বিভীষিকা দেখা যায়। গোধূলির আলো না মিলাইতেই গৃহস্থ-বাড়ীতে শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে এবং প্রদীপ জ্বালা হয়। এই সময়ে তোমরা প্রদীপের শিখাগুলিকে লক্ষ্য করিয়াছ কি? পরীক্ষা করিলে দেখিবে, প্রদীপের শিখাকে রাত্রির অন্ধকারে যেমন সাদা দেখায়, গোধূলির আলোতে সে-রকমটি দেখাইতেছে না,—ইহার রঙ্ যেন স্পষ্ট লাল হইয়া পড়িয়াছে। ইহাও এক রকম রঙের বিভীষিকা। চোখের কিপ্রাকার দোষে এই বিভীষিকাগুলি দেখা যায়, তোমাদিগকে সে-সম্বন্ধে অনেক কথা পরে বলিব।

রঞ্জক বস্তু

রঙিন আলো সম্বন্ধে তোমাদিগকে অনেক কথা বলিলাম। পূজার সময়ে পটুয়ারা হরিতাল সিন্দূর লাক্ষা প্রভৃতি যে-সকল রঞ্জক বস্তু (Pigments) দিয়া চাল-চিত্র করে এবং প্রতিমার গায়ে রঙ্ মাখায়, সেগুলির কথা তোমাদিগকে এখন বলিব।

রঙিন আলো এবং রঞ্জক জিনিসের মধ্যে প্রভেদ অনেক। তোমরা আগেই শুনিয়াছ, হলুদ ও নীল এই দুইটি পরিপূরক রঙিন আলো'কে একত্র করিলে সাদা আলো পাওয়া যায়। কিন্তু তোমরা যদি হল্‌দে রঙের হরিতালের সঙ্গে নাল বড়ির নীল রঙ্‌কে মিশাইয়া দাও, তাহা হইলে কখনই খড়ি গোলার মতো সাদা রঙ্ পাইবে না। তখন মিশ্রিত রঙ্‌টা হইয়া দাঁড়াইবে এক রকম সবুজ। কেন ইহা হয় বলা কঠিন নয়। নীল বড়ির নীল রঙের উপরে যখন সূর্য্যের সাত রঙা সাদা আলো পড়ে, তখন তাহার মধ্য হইতে লাল ও হলুদ রঙ্‌কে সে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার হরিতালের হল্‌দে রঙ্ নীল ও বেগুনে রঙ্ চুরি করে। কাজেই সূর্য্যের আলোর প্রধান রঙ্‌গুলির মধ্যে কেবল সবুজই ঐ মিশ্রিত রঙ্ হইতে প্রতিফলিত হইয়া চোখে পড়ে। ইহাতেই আমরা নীলবড়ীর নীল ও হরিতালের হল্‌দে রঙ্‌কে মিশাইলে সবুজ রঙ্

পাই। দেখ, রঙিন আলোর মিশ্রণের সঙ্গে রঞ্জক দ্রব্যের মিশ্রণের কত তফাৎ। নীল ও হলুদ রঙ্ মিলাইলে কোন রঙ হয়, তাহা তোমরা জানিলে। লাল সবুজ, হলুদ, বেগুনে, ইত্যাদি জোড়া জোড়া রঞ্জক জিনিসে কি কি রঙ্ পাওয়া যাইবে এখন বোধ করি তোমরা নিজেরাই হিসাব করিয়া বলিতে পারিবে।

বর্ণচ্ছত্র

তে-শিরা কাচের ভিতর দিয়া সূর্য্যের সাদা আলো আসিলে তাহার পিছনে যে-সাতরঙা বর্ণচ্ছত্র (Spectrum) ফিতার আকারে পড়ে, তাহার মোটামুটি কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কিন্তু সে-সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি দরকারি কথা এখনো বলা হয় নাই। সেইগুলি এখন তোমাদিগকে বলিব।

সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্র তোমরা ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, ইহাতে লাল অরুণ হলুদ সবুজ প্রভৃতি মোটামুটি সাতটা রঙ্ পরে পরে সাজানো আছে। কিন্তু সব রঙের উজ্জ্বলতা সমান নয়। বর্ণচ্ছত্র দেখিলেই বুঝিবে ইহার হলুদ ও সবুজ অংশেরই উজ্জ্বলতা বেশি। তোমাদের আগেই বলিয়াছি, ঈথরের ঢেউ হইতে আলোর উৎপত্তি হয়। কিন্তু আলো মাত্রেরই ঢেউয়ের প্রসার সমান নয়। জলের উপরে যে-ঢেউ চলে, তাহার প্রসার কি সকল সময়ে একই থাকে ? ঝড়ের সময়ে নদীতে বা সমুদ্রে যে-ঢেউ উঠে তাহা বড়, আবার মৃদু বাতাসে পুকুরের জলের উপর দিয়া যে-ঢেউ চলে তাহা নিতান্ত ছোটো। ঈথরের যে-সব ঢেউয়ে আলোর উৎপত্তি হয়, তাহারো ছোটো-বড় ভেদ আছে। লাল রঙের ঢেউ সব চেয়ে বড়। তার পরে লাল হইতে যেমন বর্ণচ্ছত্রের অরুণ হলুদ সবুজ ইত্যাদি রঙে যাওয়া যায়, তেমনি

ঢেউ ক্রমে ছোটো হইতে আরম্ভ করে এবং সব চেয়ে ছোটো ঢেউ হয় বেগুনে আলোতে। তোমাদের এসব কথা আগেই বলিয়াছি, আবার এখানেও বলিলাম। সুতরাং বর্ণচ্ছত্রের সব চেয়ে উজ্জ্বল অংশ হলুদে ও সবুজে থাকিতে দেখিয়া বলা যাইতে পারে, যে-সব আলোর ঢেউ খুব বড় নয় এবং খুব ছোটোও নয়, অর্থাৎ মাঝারি রকমের তাহাদেরি আলোর উজ্জ্বলতা বেশি।

বর্ণচ্ছত্রের নানা রঙের যেমন উজ্জ্বলতার ভেদ আছে, তেমনি তাপেরও ভেদ আছে। কোন্ আলোতে কি রকম উষ্ণতা তাহা তাপমান যন্ত্র দিয়া ঠিক করা যায়। এই পরীক্ষায় লাল রঙেই বেশি তাপ ধরা পড়ে। তা'র পরে যতই লাল হইতে হলুদ সবুজ ও নীলের দিকে যাওয়া যায়, ততই তাপ কমিতে আরম্ভ করে। তাহা হইলে দেখ, বর্ণচ্ছত্রের প্রত্যেক রঙিন আলোরই উষ্ণতা পৃথক্।

রাসায়নিক ক্রিয়া (Chemical Action) কাহাকে বলে, তাহা বোধ করি তোমরা সকলে জানো না। যে ক্রিয়াতে দুইটা তিনটা বা আরো বেশি জিনিস মিশিয়া একটা সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিস তৈয়ারি করে, তাহাকে রাসায়নিক ক্রিয়া বলা যাইতে পারে। এক টুক্‌রা লোহাকে কিছু দিন বাতাসে ফেলিয়া রাখিলে তাহাতে লাল্‌চে রঙের মরিচা ধরে। বাতাসে যে অক্সিজেন আছে, তাহা লোহার সঙ্গে মিশিয়া রাসায়নিক ক্রিয়ায় মরিচা উৎপন্ন করে। মরিচা লোহা ও অক্সিজেনের যোগে উৎপন্ন হইলেও তাহাতে অক্সিজেনের বা লোহার কোনো গুণই

থাকে না। আমাদের চারিপাশে এই রকম রাসায়নিক ক্রিয়া যে কত চলিতেছে, তাহা গুণিয়াই শেষ করা যায় না। সূর্য্যের আলোর যে রাসায়নিক শক্তি আছে, তাহা বোধ হয় তোমরা লক্ষ্য কর নাই। রঙিন কাগজকে কিছুক্ষণের জন্য রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে তাহার রঙ খারাপ হইয়া যায়। রঙিন রেশমী বা পশমী কাপড়কেও আমরা রৌদ্রে খারাপ হইতে দেখিয়াছি। আমাদের শরীরের কোনো জায়গায় ব্রণ হইলে ডাক্তার কষ্টিক ঘষিয়া জায়গাটা পুড়াইয়া দেন। যেখানে কষ্টিক্ লাগে সেখানটা কালো হইয়া যায়। কষ্টিক সাদা জিনিস, কিন্তু সূর্য্যের আলো পাইলেই কালো হইয়া যায়। এই পরিবর্ত্তনগুলি সূর্য্যের আলোর রাসায়নিক ক্রিয়াতেই হয়। কিন্তু লাল অরুণ হলুদ প্রভৃতি যে-সকল রশ্মিমিলিয়া সূর্য্যের সাধারণ আলোর উৎপন্ন করে, সেগুলির সকলের রাসায়নিক শক্তি নাই। বর্ণচ্ছত্রের বেগুনে আলোতেই ইহা বেশি দেখা যায়। তা'র পরে বেগুনে হইতে যতই লালের দিকে যাওয়া যায়, ততই সেই শক্তি কমিতে থাকে এবং শেষে লাল আলোতে তাহার চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। তোমরা বোধ হয় দেখিয়াছ, যাঁহারা ফোটোগ্রাফের ছবি তোলেন, তাঁহারা অন্ধকার ঘরে লাল আলো জ্বালাইয়া ফোটোগ্রাফের কাচ ও কাগজ নাড়াচাড়া করেন। সূর্য্যের সাধারণ আলো লাগিলেই সেগুলিতে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় এবং তখন সে-সব জিনিসে আর ছবি তোলার কাজ চলে না। লাল আলোর রাসায়নিক ক্রিয়া নাই। এই জন্যই লাল আলোতে ফোটোগ্রাফের

সরঞ্জাম নষ্ট হয় না। তাহা হইলে দেখ, সূর্য্যের রশ্মি কেবল তাপ ও আলো দিয়াই ক্ষান্ত হয় না। ইহা নানা জিনিসের রাসায়নিক পরিবর্ত্তনও করে।

আমাদের গ্রামের ও নগরের পথে ঘাটে প্রতিদিন আবর্জ্জনা ও বিষ জমা হয়, সূর্য্যের আঁলোর রাসায়নিক ক্রিয়ায় সেগুলির অনেক দোষ নষ্ট করে। কাপড়-জামা ও বিছানা-পত্র ভিজিলে আমরা শুকাইবার জন্য সেগুলিকে রৌদ্রে দিই। রৌদ্রের তাপে সেগুলি শুকাইয়া যায়। কিন্তু সূর্য্যের আলো কেবল কাপড় শুকাইবারই কাজ করে না; সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক কাজ চালাইয়া তাহাতে যে-সব বিষাক্ত জিনিস থাকে সেগুলিকেও নষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু মনে রাখিয়ো, সূর্য্যালোকের সব রশ্মির রাসায়নিক শক্তি নাই। বেগুনে রশ্মিতেই এই শক্তি বেশি থাকে, লালে তাহার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না।

সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রে কৃষ্ণরেখা

ঝাড় বা দেওয়াল-গিরির তে-শিরা পরকলার ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলো আসিলে দেওয়ালে যে-বর্ণচ্ছত্র পড়ে, তাহাতে লাল হইতে বেগুনে পর্য্যন্ত সব রঙের আলোই পরে পরে সাজানো দেখিতে পাওয়া যায় ; বর্ণচ্ছত্রের কোনো জায়গায় কোনো বিচ্ছেদ অর্থাৎ ফাঁক নজরে পড়ে না। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তাহা নয়, সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রের নানা জায়গায় ফাঁক আছে। উজ্জ্বল রঙিন আলোর মাঝে এই ফাঁকা জায়গাগুলিকে কালো রেখার মতো দেখায়। সাধারণ দেওয়াল-গিরির তে-শিরা কাচে, এই কৃষ্ণ-রেখা দেখা যায় না। কিন্তু রশ্মি-নির্ব্বাচন যন্ত্র (Spectroscope) নামে যে-একটি যন্ত্র আছে, তাহা দিয়া বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিলে সেগুলি প্রত্যক্ষ দেখা যায়। ইহাতে লালের মধ্যে পাঁচটি, হলুদে তিনটি কালো রেখা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে এবং তাহা ছাড়া সবুজ আশ্‌মান নীল ও বেগুনে অংশের অনেক রেখা নজরে পড়িবে। সূর্য্যালোকের বর্ণচ্ছত্রে এই কালো রেখাগুলির সংখ্যা এবং স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে। আজ বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিয়া যেখানে যে-রেখাগুলি দেখিলে, দশ বিশ বা এক শত বৎসর পরে আবার পরীক্ষা করিলে ঠিক্ আগের মতোই রেখাগুলিকে বর্ণচ্ছত্রে দেখা যাইবে। তাই বৈজ্ঞানিকেরা সূর্য্যের আলোর বর্ণচ্ছত্রের ছবিতে ঐ রেখাগুলিকে আঁকিয়া রাখেন। সূর্য্যের আলো ছাড়া নক্ষত্র

প্রভৃতি অন্য উজ্জ্বল জিনিসের আলোর বর্ণচ্ছত্রে কৃষ্ণরেখা থাকে। কিন্তু সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রে সেগুলি যে-রকমে সাজানো থাকে, নক্ষত্রদের বর্ণচ্ছত্রে সে-রকমে সাজানো দেখা যায় না। প্রত্যেক নক্ষত্রের বর্ণচ্ছত্র পৃথক্। আবার যদি তোমরা বিদ্যুতের বা কোনো বাষ্পের আলোর বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা কর, তবে আর একটা ব্যাপার দেখিতে পাইবে। তখন তাহাতে সেই কালো রেখার চিহ্নমাত্র নজরে পড়িবে না। সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রে যেমন কালো রেখা থাকে, ইহাতে তেমনি কালোর বদলে কতকগুলি উজ্জ্বল রেখা নজরে পড়িবে।

সূর্য্য ও নক্ষত্রদের বর্ণচ্ছত্রে কালো রেখা থাকে কেন, পণ্ডিতেরা আগে সে-সম্বন্ধে কোনো কথাই বলিতে পারিতেন না। আজকালকার পণ্ডিতেরা বর্ণচ্ছত্র সম্বন্ধে যে-সব কথা বলেন, তাহা বড় আশ্চর্য্যজনক। আমরা একে একে তোমাদিগকে তাহারি কথা বলিব।

আলোক-বিশ্লেষণ

সোনা-রূপা, মাটি-পাথর, জল-বায়ু, কাঠ-কয়লা, লবণ-গন্ধক প্রভৃতি যে-সব জিনিস আমরা সর্ব্বদা চারিদিকে দেখিতে পাই ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে যৌগিক পদার্থ এবং কতক-গুলিকে মূল পদার্থ বলা হয়। মূল পদার্থ খাঁটি জিনিস; ইহার সহিত অন্য কোনো জিনিসই মিশানো থাকে না। সোনা রূপা তামা প্রভৃতি ধাতু, গন্ধক কয়লা প্রভৃতি অধাতু এবং হাইড্রোজেন অক্সিজেন প্রভৃতি বায়ব দ্রব্য, ইহারা সকলেই মূল পদার্থ। ইহাদের সহিত অন্য কোনো জিনিস মিশানো থাকে না। কিন্তু যৌগিক পদার্থ সে-রকম নয়। প্রত্যেক যৌগিক পদার্থের সহিত দুইটা তিনটা চারিটা বা তাহারো অধিক মূল পদার্থ মিশানো থাকে জল মাটি পাথর তেল লবণ ঘৃত, যৌগিক পদার্থ। যাঁহারা রসায়ন শাস্ত্রের চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের কাছে যৌগিক পদার্থ লইয়া গেলে, নানা প্রক্রিয়ায় তাঁহারা সেগুলিতে কোন্ কোন্ মূল পদার্থ আছে তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারেন। যে-প্রক্রিয়ায় যৌগিক পদার্থকে ভাঙিয়া তাহার ভিতরকার মূল পদার্থ বাহির করা যায়, তাহাকে বলা হয় বিশ্লেষণ-ক্রিয়া (Analysis)। কিন্তু সোনা রূপা লোহা গন্ধক বা কয়লা প্রভৃতি মূল পদার্থকে তাঁহাদের কাছে দিলে, তাঁহারা সেগুলিকে বিশ্লেষ করিতে পারেন না। মূল পদার্থ খাঁটি জিনিস; ইহাতে অন্য কোনো পদার্থ

মিশানো থাকে না। তাই বিশ্লেষ করিতে গেলে তাহাতে অন্য কোনো পদার্থ ধরা পড়ে না।

কোনো পদার্থ যৌগিক কি না এবং যৌগিক হইলে তাহাতে কোন্ কোন্ মূল পদার্থ মিশানো আছে, তাহা যে কেবল রাসায়নিক ক্রিয়াতেই ঠিক্ করা যায় তাহা নয়। যৌগিক পদার্থকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া যে-আলো পাওয়া যায়, তাহার বর্ণচ্ছত্র দেখিয়াও কোন্ কোন্ মূল পদার্থ জিনিসটির মধ্যে আছে ঠিক্ করা যায়। কথাটা শুনিলে বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়, কিন্তু ইহা সত্য। কোটী কোটী মাইল দূরের নক্ষত্রে কোন্ কোন্ মূল পদার্থ পুড়িয়া আলো দিতেছে, আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা কেবল সেই আলোর বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দিতেছেন। আশ্চর্য্য নয় কি?

আলোর রঙ্ যে কত রকম হয়, তাহা বোধ করি বলিয়াই শেষ করা করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন জিনিস পুড়াইলে তাহাদের আলো প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন রঙের হয়। সোডিয়ম্ ধাতুর নাম তোমরা শুনিয়াছ কি? আমরা খাদ্যের সঙ্গে যে লবণ খাই, সোডিয়ম ধাতুই তাহার প্রধান উপাদান। যাহাতে লবণ নাই এ-রকম জিনিস্ পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখা যায়। মাটিতে জলে গাছের দেহে প্রাণীর শরীরে একটু-আধটু লবণ থাকেই। কাজেই, সোডিয়ম্ ধাতু সব জিনিসেই আছে। এই ধাতুকে গরম করিয়া যখন উজ্জ্বল করা হয়, তখন তাহা হইতে হল্‌দে রঙের আলো বাহির হইতে আরম্ভ করে। তে-শিরা পরকলায় ফেলিয়া বর্ণচ্ছত্র

উৎপন্ন করিলে তাহাতেও কেবল একটা হল্‌দে রেখা দেখা যায়। সোডিয়মের মতো পোটাসিয়ম্‌ নামে একটি মূল ধাতু আছে। আমরা সোরা দিয়া তুবড়ি ও হাউই বাজির বারুদ তৈয়ারি করি, তাহাতে অনেকটা করিয়া পোটাসিয়ম্‌ ধাতু মিশানো থাকে। পোটাসিয়ম্‌ পুড়াইলে কতকটা বেগুনে আলো পাওয়া যায় এবং তাহার বর্ণচ্ছত্রেও দুইটা খুব উজ্জ্বল রেখা দেখা যায়। একটার রঙ্‌ হয় লাল এবং অন্যটার রঙ হয় প্রায় বেগুনে। এই রকমে প্রত্যেক মূল ধাতুর এবং প্রত্যেক মূল পদার্থের বাষ্পকে পুড়াইয়া উজ্জ্বল করিলে, প্রত্যেকের আলো হইতে এক-একটা নির্দ্দিষ্ট বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়। হাইড্রোজেনের বর্ণচ্ছত্রে চারি-পাঁচটা, লোহা পুড়াইলে যে-আলো পাওয়া যায় তাহাতে আরো কতকগুলি উজ্জ্বল রেখা দেখা যায়। কিন্তু এই সকল বর্ণচ্ছত্রের একটার সঙ্গে অন্য কোনোটার মিল থাকে না। অর্থাৎ তামাকে বাষ্পীভূত করিয়া পুড়াইলে যে-বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়, তাহা লোহা সোনা, রূপা গন্ধক, ফস্‌ফরাস্‌ বা অন্য কোনো মূল পদার্থের বর্ণচ্ছত্রের সহিত কখনই মিলিবে না। এই ব্রহ্মাণ্ডে মূল পদার্থের সংখ্যা বেশি নয়। তাই কোন্‌ মূল পদার্থ হইতে কি-রকম বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায় তাহা বৈজ্ঞানিকেরা রঙ্‌ দিয়া আঁকিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রত্যেক মূল পদার্থের এক-একটি নির্দ্দিষ্ট বর্ণচ্ছত্র আছে, এই আবিষ্কারটি আমাদের জ্ঞানের সীমাকে যে, কতদূর বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা বোধ করি অনুমানও করা যায় না। মনে কর,

তুমি সন্ধ্যার সময়ে ঘরের বারান্দায় বসিয়া আছ এবং দশ মাইল দূরে একটা পাহাড়ের উপরে যে-আগুন জ্বলিতেছে তাহার ক্ষীণ আলো তোমার চোখে আসিয়া পড়িতেছে। এখন যদি কেহ, কি-কি পদার্থ পুড়িয়া সেই আলো উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইতে হয় না কি? বৈজ্ঞানিকেরা সত্যই এই রকমই আশ্চর্য্যজনক কাজ করিতেছেন। দশ-বিশ মাইল নয়, কোটী কোটী মাইল দূরের নক্ষত্রে কোন্ কোন্ পদার্থ পুড়িতেছে, তাঁহারা ঘরে বসিয়া তাহা বলিয়া দিতেছেন। কি-রকমে বলিতেছেন, এখন তোমরা বুঝিতে পারিবে।

তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত ধ্রুব তারাটিকে দেখিয়াছ। রাত্রিতে উত্তর আকাশে ইহাকে প্রতিদিনই একই জায়গায় থাকিয়া জ্বলিতে দেখা যায়। ধ্রুব তারার উদয়াস্ত নাই। মনে কর, ধ্রুব নক্ষত্র কোন্ কোন্ মূল পদার্থ জ্বালাইয়া পুড়াইয়া আলো দিতেছে, তাহাই যেন আমরা জানিতে চাহিতেছি। বৈজ্ঞানিকদের কাছে গেলে, তাঁহারা সেই নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোর বর্ণচ্ছত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার কোথায় কি-রকম আলোর রেখা আছে দেখিয়া লন এবং তা'র পরে সেই সকল আলোক-রেখার সঙ্গে কোন্ কোন মূল পদার্থের বর্ণচ্ছত্রের মিল আছে পরীক্ষা করেন। এই ধরিয়া নক্ষত্রটিতে কোন্ কোন্ পদার্থ পুড়িতেছে অনায়াসে জানা যায়। একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। অভিধান তৈয়ারির সময়ে অভিধানকার কি করেন, তোমরা বোধ হয় তাহা জানো না। তিনি সমস্ত কথা সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রত্যেকটির অর্থ অভিধানে লিখিয়া

রাখেন। তা'র পরে কোনো বই পড়িবার সময়ে যখন কোনো কথার মানে দেখার দরকার হয়, তখন আমরা অভিধান খুঁজিলেই মানে জানিতে পারি। কোনো আলোর বর্ণচ্ছত্র দেখিয়া কোন্ কোন্ জিনিস পুড়িয়া সেই আলো উৎপন্ন করিতেছে স্থির করিতে গেলে, অভিধান দেখার মতোই কাজ করিতে হয়। সব মূল জিনিসের বর্ণচ্ছত্র বৈজ্ঞানিকেরা আগেই আঁকিয়া জুঁকিয়া রাখেন। তা'র পরে কোনো অজানা জিনিসের বর্ণচ্ছত্র পাইলে তাহা কোন্ কোন্ মূল পদার্থের বর্ণচ্ছত্রের সহিত মিলিল দেখিয়া জিনিসটা কি তাহা অনায়াসে জানিয়া লন।

এই রকমে বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিয়া মূল পদার্থের যেমন অব্যর্থ সন্ধান পাওয়া যায়, অন্য কোনো উপায়েই তাহা পাওয়া যায় না। কেবল ইহা নয়। বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিয়া অনেক নূতন মূল পদার্থেরও আবিষ্কার হইয়া পড়িয়াছে। মনে কর, কোনো দূর নক্ষত্রের আলো বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিতে গিয়া হঠাৎ তাহাতে এমন কতকগুলি উজ্জ্বল রেখা দেখা গেল, যাহা আমাদের জানাশুনা কোনো মূল পদার্থের রেখার সহিত মিলিল না। কাজেই, তখন সেগুলি কোনো অজানা নূতন মূল পদার্থ পুড়িয়া উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া স্থির করিতে হয়। বাস্তবিকই এই রকমে রুবিডিয়ম, থালিয়ম্ এবং সিসিয়ম্ প্রভৃতি অনেক মূল পদার্থের আবিষ্কার হইয়াছে। এপর্য্যন্ত সেগুলি সাধারণের দৃষ্টি এড়াইয়া কেহ সূর্য্যালোকে, কেহ ধ্রুব-লোকে, কেহ নক্ষত্রলোকে, কেহ বাতাসে, কেহ জলে বাস করিতেছিল। এখন বর্ণচ্ছত্রের

ফাঁদে পা দিয়া তাহারা ধরা পড়িয়া গেছে। আমাদের চোখ যাহাদের সন্ধান পায় নাই বিজ্ঞান তাহাদিগকে খুঁজিয়া চোখের সম্মুখে ধরিতেছে, আশ্চর্য্য নয় কি? এই রকমেই দিনে দিনে আমাদের জ্ঞানের সীমা বাড়িয়া চলিয়াছে।

যাহা হউক, তোমরা মনে রাখিয়ো, মূল পদার্থ বাষ্পীভূত হইয়া জ্বলিতে থাকিলে, তাহাদের প্রত্যেকটির আলো হইতে এক একটি নির্দ্দিষ্ট বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়। আবার এক মূল পদার্থের বর্ণচ্ছত্রের সহিত অন্য মূল পদার্থের বর্ণচ্ছত্রের কখনই হুবহু মিল দেখা যায় না। এই কথাগুলি মনে রাখিলে সূর্য্যের এবং নক্ষত্রদের বর্ণচ্ছত্রে কেন কালো রেখা দেখা যায়, তাহা বুঝিতে পারিবে।

আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, যাঁহারা অকাতরে দান করেন, তাঁহারা চুরি করেন না। দানশীলতা ও চুরিবিদ্যা প্রায়ই একাধারে দেখা যায় না। কিন্তু আলোতে ইহা দেখা যায়। একটা উদাহরণ দিলে আমার কথাটা তোমরা বুঝিতে পারিবে। তোমাদের আগেই বলিয়াছি, সোডিয়ম্ ধাতুকে পুড়াইলে হল্‌দে আলো পাওয়া যায়। তে-শিরা কাচ দিয়া সেই আলো'কে ভাঙিলে বর্ণচ্ছত্রে একটা উজ্জ্বল হল্‌দে রেখামাত্র নজরে পড়ে। মনে করা যাউক, যেন সোডিয়ম্ পুড়িয়া চারিদিকে অকাতরে হল্‌দে আলো বিলাইতেছে এবং তাহারি ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলো বা অন্য কোনো সাদা আলো বাহিরে আসিতেছে। এই অবস্থায় সোডিয়মের জ্বলন্ত বাষ্প যে কাণ্ড করে, তাহা বড় মজার। সে

সাদা আলোর ভিতরকার লাল অরুণ হলুদ সবুজ প্রভৃতি সব রঙের আলো'কে নিজের দেহের ভিতর দিয়া যাইতে দেয় না,—কতকগুলি রশ্মিকে চুরি করিয়া ফেলে। কোন্ রশ্মি চুরি করে? নিজে জ্বলিয়া পুড়িয়া সে নিজের শরীর হইতে যে হল্‌দে রশ্মি বাহির করে, সাদা আলো হইতে ঠিক সেই রশ্মিগুলিকে চুরি করিয়া বসে। কাজেই, সোডিয়মের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিলে সাদা আলোতে লাল অরুণ সবুজ আশ্‌মান নীল বেগুনে প্রভৃতি সব রশ্মিই থাকে, থাকে না কেবল হলুদ রশ্মি। এখন যদি এই হলুদবর্জ্জিত সাদা আলোর একটা বর্ণচ্ছত্র প্রস্তুত করিয়া তোমরা পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, তাহাতে লাল হইতে আরম্ভ করিয়া বেগুনে পর্য্যন্ত সব রঙেরই আলো আছে,—নাই কেবল হল্‌দে আলো। কাজেই, বর্ণচ্ছত্রের হল্‌দের জায়গায় একটা কালো দাগ নজরে পড়িবে। তাহা হইলে দেখা গেল, সোডিয়ম্ নিজে পুড়িয়া যে-আলো দান করে, অন্য আলো তাহার ভিতর দিয়া আসিতে গেলে ঠিক্ সেই আলোটিকে কাড়িয়া লয়। অর্থাৎ যাহা সে দান করে, অন্যের কাছ হইতে তাহাই কাড়িয়া লইয়া বেমালুম হজম করে।

আমরা সোডিয়মের চুরিবিদ্যার পরিচয় দিলাম। ইহা শুনিয়া মনে করিয়ো না, যেন কেবল সোডিয়মই আলো চুরি করে। মূলপদার্থ মাত্রেরই এই বিদ্যা বিলক্ষণ জানা আছে। লোহা পুড়িয়া যে আলো দেয়, তাহার ভিতর দিয়া সাদা আলো আসিলে লোহা নিজে যে-আলো দিতেছে সেগুলিকে চুরি করিয়া

ফেলে। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, গন্ধক, কয়লা, তামা, সীসা প্রভৃতি সব ধাতু ও অধাতু মূলপদার্থই এই রকম চুরি করিতে জানে। প্রায় সত্তর বৎসর আগে বুনসেন্ ও কির্কফ নামে দু'জন পণ্ডিত প্রথমে সোডিয়মেরই এই চুরিবিদ্যা দেখিয়াছিলেন। তাই সোডিয়মেরই কথা তোমাদিগকে বলিলাম।

যাহা হউক, সূর্য্যের ও নক্ষত্রদের বর্ণচ্ছত্রের মাঝে মাঝে কেন কালো রেখা থাকে, এখন বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। ইহাদের দেহের ভিতর হইতে যে সাদা আলো আসে, তাহা হইতে কতকগুলি করিয়া রঙিন রশ্মি চুরি যায়, তাই সাদা আলোর যে লাল হইতে বেগুনে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বর্ণচ্ছত্র হয়, তাহার জায়গায় জায়গায় ফাঁক থাকে। আমরা বর্ণচ্ছত্রে এই ফাঁকা জায়গাগুলিকে কালো রেখার আকারে দেখিতে পাই। কিন্তু চুরি করে কে? নিশ্চয়ই কোনো জ্বলন্ত মূলপদার্থের দ্বারা এই কুকার্য্যটি হয়। কিন্তু সেই জ্বলন্ত পদার্থ কোথায় থাকে? ইহার উত্তরে বৈজ্ঞানিকেরা যাহা বলেন, তাহা শুনিলে তোমরা অবাক্ হইবে। সূর্য্যের আলো মহাশূন্যের কোটী কোটী মাইল পথ চলিয়া এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া আমাদের কাছে আসে। এই রাস্তার মাঝে আলো চুরি করার মতো জ্বলন্ত মূল পদার্থ কোথাও নাই। কাজেই, বলিতে হয়, সূর্য্যালোকে এবং নক্ষত্র-লোকেই আলো চুরি যায়। তোমরা বোধ হয় জানো, সূর্য্য ও নক্ষত্রেরা স্বয়ংপ্রভ জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ তাঁহাদের দেহের মাটি-পাথর, ধাতু-অধাতু সব জিনিসই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া-পুড়িয়া আলো

দেয়। কেবল ইহাই নয়, আমাদের পৃথিবীকে ঘিরিয়া যেমন বায়ুমণ্ডল আছে, এই সব জ্যোতিষ্কের চারিদিকে সেই রকম জ্বলন্ত বাষ্পের আবরণ আছে। ইহাতে লোহা, সোডিয়ম্ পটাসিয়ম্, হাইড্রোজেন প্রভৃতি অনেক মূল পদার্থের বাষ্প থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, সূর্য্যের ভিতরকার সাদা আলো যখন এই বাষ্পমণ্ডল ভেদ করিয়া আসে, তখন সেই বাষ্পমণ্ডলে যে-সব মূল পদার্থ থাকে, তাহারা নিজেদের আলোগুলিকে চুরি করিয়া লয়। কাজেই, ঐ-সব জ্যোতিষ্ক হইতে যে-আলো বাহির হইয়া আমাদের কাছে পৌঁছায়, তাহাতে অনেক রঙিন আলোর রশ্মির অভাব থাকিয়া যায়। ইহাতেই বর্ণচ্ছত্রে অনেক কালো রেখা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

তাহা হইলে দেখ, সূর্য্য বা নক্ষত্রদের বর্ণচ্ছত্রে কোন্ কোন্ রঙের অভাব আছে এবং সেই রঙগুলি কোন্ কোন্ মূল পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন হয় জানিয়া লইলেই সূর্য্য ও নক্ষত্রলোকের বাষ্পমণ্ডলে কোন্ কোন্ মূল পদার্থ আছে, তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা একটা ছোটো যন্ত্র দিয়া সূর্য্যের ও নক্ষত্রদের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিতেছেন এবং ঘরের কোণে বসিয়াই কোটী কোটী ক্রোশ তফাতের নক্ষত্রেরা কি কি মূল পদার্থ দিয়া গঠিত তাহা বলিয়া দিতেছেন। আশ্চর্য্য নয় কি? এই রকমে নক্ষত্রদের খবর যে কোনো কালে জানা যাইবে, তাহা এক শত বৎসর আগেকার লোকে স্বপ্নেও ভাবিতেন না।

রশ্মিনির্ব্বাচন যন্ত্র

তে-শিরা পরকলায় পড়িলে আলো মাত্রেই বিশ্লিষ্ট হইয়া বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করে এবং তাহাতে যে-সব মূল রঙের রশ্মি মিশানো থাকে সেগুলি বর্ণচ্ছত্রে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই কথাটা তোমরা বার বার শুনিয়াছ। কি রকমে তে-শিরা পরকলায় বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন হয়, তাহাও তোমাদিগকে বলা হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ উপায়ে ক্ষীণ আলোর বর্ণচ্ছত্র তৈয়ার করিতে গেলে মুস্কিলে পড়িতে হয়। তাই বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষার জন্য একটি যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। ইহাতে খুব ক্ষীণ আলোরও বর্ণচ্ছত্র দেখা যায়, এবং বর্ণচ্ছত্রে যে কালো রেখাগুলি থাকে সেগুলি সুস্পষ্ট নজরে পড়ে। ইংরাজিতে এই যন্ত্রটিকে (Spectroscope) বলা হয়। বাংলায় তাহাকে রশ্মিনির্ব্বাচন যন্ত্র বলা যাইতে পারে। যন্ত্রটি বড় নয়। ছোটো বাক্সে পুরিয়া যেখানে ইচ্ছা লওয়া যায়।

পরপৃষ্ঠায় যন্ত্রটির একটা ছবি দিলাম। দেখ যন্ত্রে দুইটি নল লাগানো আছে এবং মাঝে আছে একখানি তে-শিরা পরকলা। ঐ নল দুইটিকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র বলা যাইতে পারে। দূরবীনের ভিতরে যেমন পরকলা লাগানো থাকে, এগুলিতেও সেই রকম

পরকলা আছে। ডাইনের নলটিকে চোখে লাগাইয়া বর্ণচ্ছত্র দেখিতে হয়। অন্য নলের মুখে যে খুব সরু খাঁজ-কাটা আছে, সেই পথে আলো আসিয়া তে-শিরা কাচের উপর পড়ে এবং সেখানে বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রথম নলে প্রবেশ করে। কাজেই, এই
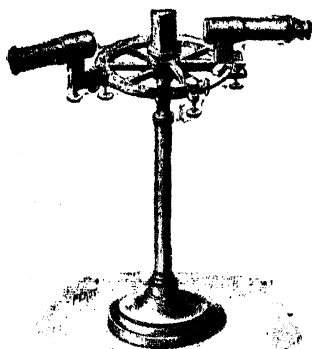
নলের পিছনে চোখ রাখিলে বাহিরের আলোর একটি সুন্দর বর্ণচ্ছত্র নজরে পড়ে। দ্বিতীয় নলের আগায় যে একটা স্ক্রু দেখিতেছ, সেটিকে ঘুরাইলে নলের মুখের খাঁজকে ইচ্ছামত সরু বা মোটা করা যায়, এবং খাঁজের সম্মুখে কোনো জিনিসকে পুড়াইলে তাহার আলো নলের ভিতরে আনা যায়। এই যন্ত্রে যে-বর্ণচ্ছত্র হয়, তাহা অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট দেখায়।

ইহার পরের ছবিখানি লক্ষ্য কর। দেখ, ইহাতে সোডিয়ম্ ঘটিত কোনো দ্রব্য পোড়ান হইতেছে। ছবির ডান পাশে যে তে-শিরা পরকলা আছে, তাহাতে সোডিয়মের ঐ আলো একখানি
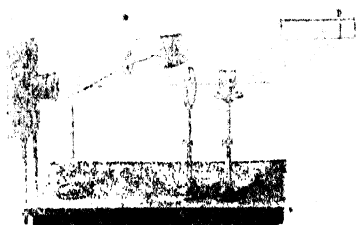
কুব্জপৃষ্ঠ পরকলায় একত্র হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে যে বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে সোডিয়মের হল্‌দে আলো "D" চিহ্নিত জায়গায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

রামধনু

তোমরা সকলেই রামধনু দেখিয়াছ। এসম্বন্ধে তোমা-দিগকে আগেই কিছু বলিয়াছি। বৃষ্টির সময়ে জলের বিন্দুর উপরে যখন সূর্য্যের আলো পড়ে, তখন সূর্য্যের বিপরীত দিকে আকাশ জুড়িয়া রামধনুর উদয় হয়। সূর্য্যের আলোর বর্ণচ্ছত্রে যতগুলি রঙ্ আছে, তাহার সবগুলিই স্তরে স্তরে রামধনুতে সাজানো থাকে। লাল থাকে সকলের উপরে, তা'র পরে অরুণ, তা'র পরে হলুদ, ইত্যাদি। কখনো কখনো আকাশে আবার দুইটা রামধনুর উদয় হয়। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? এই দ্বিতীয় ধনুটি প্রথমটির বাহির দিকে থাকে। কিন্তু ইহার রঙ্‌গুলিকে কখনই প্রথমটির মতো উজ্জ্বল দেখায় না। তা'র পরে আবার রঙ্‌গুলি সাজানো থাকে উল্‌টা রকমে। অর্থাৎ সকলের উপরে থাকে বেগুনে, তা'র পরে নীল, তা'র পরে আশ্‌মান ইত্যাদি। এইবারে যখন আকাশে দুইটা রামধনু উঠিবে, তখন তোমরা এগুলি লক্ষ্য করিয়ো। বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমরা একবার তিনটা রামধনুরও উদয় দেখিয়াছি। কিন্তু তৃতীয় ধনুর রঙ এত অনুজ্জ্বল থাকে যে, হঠাৎ নজরে পড়ে না।

যাহা হউক কি-রকমে রামধনুর উৎপত্তি হয়, তাহা বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। সূর্য্যের সাদা আলো বৃষ্টির বিন্দুতে বিবর্ত্তিত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া রামধনুর রচনা করে। তে-শিরা

পরকলার বিশ্লেষণ যেমন, ইহাও কতকটা যেন সেই রকমেরই ব্যাপার।

সূর্য্যের আলো একটা জলবিন্দুতে প্রবেশ করিয়া কি-রকমে বিবর্ত্তিত ও বিশ্লিষ্ট হয় জানিতে পারিলে অন্য বৃষ্টিবিন্দুতে তাহার কি-রকম পরিবর্ত্তন হইবে তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে। অতএব মনে করা যাউক, লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বৃষ্টির বিন্দুর মধ্যে যেন একটির ভিতরে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করিয়াছে। তোমরা জানো, আলোর রশ্মি স্বচ্ছ পাত্‌লা জিনিস হইতে স্বচ্ছ ঘন জিনিসে প্রবেশ করিবার সময় বিবর্ত্তিত হয়। বাতাস পাত্‌লা জিনিস এবং জলবিন্দুর জল ঘন বস্তু। সুতরাং জলবিন্দুতে প্রবেশের সময়ে সূর্য্যরশ্মির বিবর্ত্তন ঘটে। কেবল বিবর্ত্তন নয়, তে-শিরা পরকলায় প্রবেশ করিলে আলোর রশ্মি যেমন বিশ্লিষ্ট হয়, এখানে তাহাও ঘটে। কাজেই, সূর্য্যের সাদা আলোতে যে লাল অরুণ হলুদ প্রভৃতি রঙের রশ্মি মিশানো ছিল সেগুলি পৃথক্ হইয়া পড়ে। কিন্তু এই রঙিন রশ্মিগুলি জলবিন্দুর ভিতরে আবদ্ধ থাকে না। অধিকাংশই তাহার পিছন দিক্ দিয়া বাহিরে আসিয়া আকাশে ছুটিয়া চলে। সেগুলি পৃথিবীবাসী আমাদের চোখে পড়ে না। চোখে পড়ে কেবল সেই রশ্মিগুলি যাহা জলবিন্দুর ভিতরে পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া আবার একটা বিবর্ত্তনের পরে বাহিরে আসে। কাজেই, এই রশ্মি চোখে পড়িলে আমরা সূর্য্যের সাদা আলোর ভিতরকার নানা রঙের রশ্মির মধ্যে কেবল মাত্র একটিকে আকাশের দিকে দেখিতে পাই। এই রকমে অন্য জল-বিন্দু হইতে অন্য রঙিন

রশ্মি আমাদের চোখে পড়ে। ইহাতেই আমরা বর্ণচ্ছত্রের সাতরঙে আঁকা রামধনু আকাশের গায়ে দেখিতে পাই। কিন্তু মনে রাখিয়ো, আমরা দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যে রামধনু দেখি, তাহা একই রামধনু নয়। যে-সব জলবিন্দু সূর্য্যের আলো ভাঙিয়া আমাকে লাল হইতে বেগুনে পর্য্যন্ত রঙ্ দেখাইতেছে সে-সব জলবিন্দু তোমার চোখে কোনো রশ্মিই ফেলিতে পারিতেছে না। তুমি সেই রঙ্‌গুলিকে দেখিতেছ, আর এক প্রস্ত জলবিন্দুর সাহায্যে। কাজেই, আমি যে-রামধনুকে দেখিতেছি, ঠিক্ পাশে দাঁড়াইয়া তুমি সেই রামধনুকে দেখিতে পাইতেছ না।

রামধনুকে কখনো আকাশের খুব উপরে এবং কখনো নীচে দেখা যায়। ইহা তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ। বিকালে পাঁচটা বা ছয়টার সময়ে বৃষ্টি হইলে যে রামধনু পূবে উদিত হয়, তাহা যতটা উঁচুতে থাকে, চারিটার সময়কার রামধনুকে কখনই ততটা উঁচুতে দেখা যায় না। সূর্য্য আকাশের যত উপরে থাকে, রামধনু তত ছোটো হয় এবং সূর্য্য যত নীচে নামে ততই তাহা বড় হইতে আরম্ভ করে। সূর্য্য যখন ভূতল হইতে বিয়াল্লিশ ডিগ্রি এবং তাহার চেয়ে বেশি উপরে থাকে, তখন কোনো রামধনুই দেখা যায় না। এই জন্য বেলা দুইটা তিনটায় বা দুপুরে রামধনুর উদয় হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা এই সব ব্যাপার কি-রকম হিসাবপত্র করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা এখন বুঝিতে পারিবে না। আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমরা যখন বড় বড় বই পড়িবে, তখন তাহা জানিতে পারিবে।

অদৃশ্য আলো

আমাদের চোখ কান নাক জিভ্ প্রভৃতি নানা ইন্দ্রিয় আছে। আমরা চোখে দেখিয়া, কানে শুনিয়া, এবং নাকে গন্ধ শুঁকিয়া ভাবি, যাহা দেখিতেছি শুনিতেছি এবং শুঁকিতেছি তাহাই বুঝি চরম। কিন্তু একথা ঠিক নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি খুবই কম। কুকুর কি-রকমে গন্ধ শুঁকিয়া শিকার ধরে তোমরা তাহা দেখ নাই কি? যে-সব গন্ধ আমাদের নাকে লাগে না, কুকুর ও অন্যান্য ইতর প্রাণীর নাকে তাহা ধরা পড়ে। দেখ, আমাদের ঘ্রাণ-শক্তি কত কম। তোমরা বোধ হয় জানো, জলে যেমন ঢেউ উঠে সেই রকম বাতাসে ঢেউ উঠিয়া কানে ধাক্কা দিলে আমরা শব্দ শুনিতে পাই। জলের ঢেউয়ের মতো শব্দের ঢেউ কখনো ছোটো কখনো বা বড় হয়। আমরা বড় ঢেউয়ে মোটা এবং ছোটো ঢেউয়ে মিহি শব্দ শুনি। এই শুনার মধ্যেও একটা সীমা আছে। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, বাতাসের যে-সব বড় ঢেউ আমাদের কানে সেকেণ্ডে ষোল বারের কম ধাক্কা দেয়, সেগুলির আমরা শব্দ শুনিতে পাই না। অর্থাৎ সেকেণ্ডে ষোল বারের কম ধাক্কায় যে খুব মোটা শব্দ হয়, তাহাতে আমাদের কান সাড়া দেয় না। আবার ঢেউয়ের ধাক্কার সংখ্যা বাড়িয়া সেকেণ্ডে আট চল্লিশ হাজার হইয়া দাঁড়াইলে যে খুব মিহি শব্দ

হয়, তাহাও আমরা শুনিতে পাই না। সুতরাং বলিতে হয়, বাতাস সেকেণ্ডে ষোল হইতে আটচল্লিশ হাজার বার কাঁপিয়া যে-সব শব্দ উৎপন্ন করে আমরা কেবল তাহাই শুনিতে পাই। ষোলর কম এবং আটচল্লিশ হাজারের বেশি ধাক্কায় যে-সব শব্দ হয়, সেগুলি যে কি-রকম, তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। হয় ত মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীরা তাহা শুনিতে পায়। আলো দেখা সম্বন্ধে আমাদের চোখের শক্তির ঠিক্ এই রকমেরই একটা সীমা আছে। এখন সেই কথাটা তোমাদিগকে বলিব।

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, বাতাসের ঢেউ কানে ধাক্কা দিলে যেমন শব্দ শুনা যায়, তেমনি ঈথরের ঢেউ চোখে আসিয়া পড়িলে আলো দেখা যায়। কিন্তু সব ঢেউয়ে আলো দেখা যায় না; নানা অবস্থায় নানা জ্বলন্ত জিনিস ঈথরে ছোটো বড় নানা আকারের ঢেউ তোলে। আমাদের চোখ্ সেগুলির মধ্যে কেবল কয়েকটিতে সাড়া দিয়া আলো দেখায়। যে-সব ঢেউ লম্বায় এক ইঞ্চির $\frac{২৭১}{১০০০০০০০}$ অংশের সমান, সেগুলি চোখে আসিয়া ধাক্কা দিলে আমরা লাল আলো দেখি। ইহার চেয়ে বড় ঢেউ চোখে পড়িলে কোনো আলোই দেখা যায় না। যে-ঢেউগুলি চোখে ঠেকিলে আমরা বেগুনে আলো দেখি, সেগুলি লালের ঢেউয়ের চেয়ে অনেক ছোটো। হিসাব করিলে তাহাদের দৈর্ঘ্য হইয়া দাঁড়ায় এক ইঞ্চির $\frac{১৫৯}{১০০০০০০০}$ ভাগের সমান। কিন্তু ইহার চেয়ে ছোটো ঢেউ যখন আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে, তখন তাহাতে কোনো আলো দেখা যায় না। এই সব

ছোটো ঢেউয়ের যে রাসায়নিক শক্তি থাকে, তাহা দেখিয়া সেগুলির অস্তিত্ব জানা যায় মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে-বড় ঢেউয়ে লাল রঙ্ হয় এবং যে-ছোটো ঢেউয়ে বেগুনে রঙ্ দেখা যায়, এই দুইয়ের মাঝের ঢেউগুলিতে আমাদের চোখ্ সাড়া দেয়। লালের ঢেউয়ের চেয়ে বড় এবং বেগুনের ঢেউয়ের চেয়ে ছোটো ঢেউয়ে আমাদের চোখ্ অন্ধ। অর্থাৎ সেই সব ঢেউ আমাদের আলো দেখাইতে পারে না। হয় ত মানুষ ছাড়া অপর প্রাণীর চোখে পড়িলে তাহারা ইহাতে নূতন আলো দেখে এবং দেখিয়া আনন্দ পায়। আমরা যে-চোখ্ লইয়া এত অহঙ্কার করি, তাহা কত অক্ষম এবং কত দুর্ব্বল একবার ভাবিয়া দেখ।

তোমরা মনে রাখিয়ো, সমুদ্রের বড় ঢেউ এবং পুষ্করিণীর ছোটো ঢেউয়ের কাজ পৃথক্ হইলেও সেগুলি যেমন গোড়ায় একই ব্যাপার, সেই রকম ঈথরের ছোটো বড় ঢেউয়ের কাজ ভিন্ন ভিন্ন দেখা গেলেও তাহারা গোড়ায় এক। জলের বড় ঢেউয়ে পাহাড় ধসিয়া যায়, গ্রাম-নগর ভাসিয়া জলে পড়ে। কিন্তু ছোটো ঢেউয়ে সেই সব উৎপাত থাকে না। জলকে একটু চঞ্চল করিয়া কুল্ কুল্ শব্দ করা এবং জলের উপরকার লতাপাতাকে একটু দোল দেওয়াই তাহার কাজ। ঈথরের ঢেউ সম্বন্ধে ঠিক্ সেই কথাই বলা যায়। বিশেষ জায়গায় ঠেকিয়া তাহা কখনো আলো দেখায়, কখনো তাপ উৎপন্ন করে, কখনো বা রাসায়নিক কাজ দেখাইতে আরম্ভ করে। মনে কর, সূর্য্য হইতে যে ছোটো এবং বড় নানা আকারের ঢেউ বাহির হয়, সেগুলি যেন একটা

কালো পাথরের উপর পড়িল। পাথরের চেতনা নাই এবং তাহার চোখও নাই। সে, আলো দেখিল না। গায়ের রঙ্ কালো বলিয়া সব রঙিন্ ঢেউগুলি পাথরের ভিতর প্রবেশ করিল এবং তাহাতে সেখানি গরম হইয়া পড়িল। অর্থাৎ ঈথরের ঢেউ কেবল তাপ উৎপন্ন করিযা নিজের অস্তিত্ব জানাইল। আবার মনে কর, সূর্য্য-কিরণের সেই ছোটো-বড় ঢেউগুলিই যেন একখানি ফটো-গ্রাফের কাচে পড়িল। কাচ গরম হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈথরের খুব ছোটো ঢেউগুলির স্পর্শে তাহা কালো হইয়া দাঁড়াইল। এখানে ঈথর-কম্পনে তাপ ও রাসায়নিক ক্রিয়া দুই-ই প্রকাশ পাইল। তাহা হইলে দেখ, ঈথরের ঢেউকে তাপ, আলো, রাসায়নিক শক্তি বা অন্য কিছু বলা যায় না। উহা এক রকম শক্তির আকারে পৃথিবীতে আসে এবং তা'র পরে চেতন-অচেতন নানা জিনিসে অবস্থাবিশেষে তাপ আলো, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি দেখায়। তোমরা মনে রাখিয়ো, কোনো উজ্জ্বল জিনিস হইতে যে-শক্তি ঈথরের ঢেউয়ের আকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তাহার এক কণাও ক্ষয় পায় না। কোনো জিনিসে ঠেকিলে তাহা নানা রকম শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।

আরো দুই একটা উদাহরণ দিলে বোধ করি তোমরা বিষয়টি ভালো বুঝিতে পারিবে। তোমরা নিশ্চয়ই কুইনিন্ মিক্‌চার দেখিয়াছ। কি ভয়ানক তিতো! কিন্তু ইহা জ্বরের একটি মহৌষধ। শিশিতে থাকিলে ইহার রঙ্ জলের মতো সাদা দেখায়, কিন্তু রৌদ্রে তাহার রঙ্ হইয়া দাঁড়ায় কতকটা বেগুনে।

কেন ইহা হয়, তোমরা বোধ হয় জানো না। তোমরা আগেই শুনিয়াছ সূর্য্য হইতে বা অন্য জ্বলন্ত বস্তু হইতে যে-সব খুব ছোটো ঢেউ আসে, তাহা চোখে পড়িলে আমাদিগকে কোনো আলো দেখাইতে পারে না। কিন্তু কুইনিন মিক্‌চারে পড়িলে তাহা সেই ঢেউয়ের শক্তি শোষণ করিয়া রাখে এবং পরে তাহাকেই বেগুনে আলোর আকারে প্রকাশ করে। হীরা এবং ফ্লোর-স্পার (flour spar) নামক আকরিক জিনিসেও এই রকম কাজ দেখা যায়। কিছুক্ষণ আলোতে রাখিয়া অন্ধকার ঘরে আনিলে এগুলি হইতেও আলো বাহির হইতে দেখা যায়। তোমরা সকলেই কেরোসিন তেল দেখিয়াছ। সাধারণ কেরোসিন যখন ক্যানেস্তারায় থাকে তখন তাহার রঙ্ যেন কতকটা বাদামি দেখায় কিন্তু রৌদ্রে রাখিলে সেই তেলেরই রঙ্ হইয়া দাঁড়ায় কতকটা নীল রকমের। কেরোসিন ঈথরের ছোটো ঢেউগুলির শক্তি চুরি করিয়া রাখে। তা'র পরে সেই শক্তিকেই সে নীল বা বেগুনে আলোর আকারে বাহির করিয়া দেয়। বিনা তাপে এই রকম আলো বাহির করাকে বৈজ্ঞানিকেরা প্রস্ফুরণ (Phosphoresence) বলেন। গন্ধক-ঘটিত বেরিয়ম্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ এবং ক্যাল্‌সিয়ম্ প্রভৃতি ধাতুতেও এই গুণটি দেখা যায়। লাল দেশালাইয়ের কাঠির মাথায় যে ফস্‌ফরস্ থাকে, কিছুক্ষণ বাতাসে রাখিলে তাহা হইতে আলো বাহির হয় এবং ঘষিলে দেওয়ালের গায়ে আলোর রেখা আঁকিয়া যায়। ইহাকে যেন তোমরা প্রস্ফুরণ মনে করিয়ো না। কাঠে আগুন দিলে তাহা জ্বলিয়া যেমন আলো

দেয়, ফস্‌ফরস্‌ও সেই-রকম বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে জ্বলিয়া আলো দিতে থাকে। ইহাকে প্রস্ফুরণ বলা যায় না।

আর একটা উদাহরণের কথা বলি। ক্লোরিন্‌ ও হাইড্রোজেন্‌ দুই-ই বায়ব জিনিস। কাচের পাত্রে এই দুইটি জিনিসকে মিশাইয়া ছায়াতে রাখিয়া দিলে দুইয়ে মিলিয়া হাইড্রোক্লোরিক এসিড নামে একটা তরল জিনিস উৎপন্ন করে। কিন্তু সেই পাত্রকেই যদি তোমরা অল্পক্ষণের জন্য রৌদ্রে রাখিয়া পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, রৌদ্রের আলোর শক্তিতে পাত্রের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন হঠাৎ পিস্তলের মতো আওয়াজ করিয়া মিলিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পাত্রটি ভাঙিয়া চূর্ণ হয়। দেখ, ঈথরের ঢেউয়ের শক্তি কত।

আলোয় আলোয় অন্ধকার

আলোতে অন্ধকার দূর হয় এবং তখন অন্ধকারের জিনিস-গুলাকে সুস্পষ্ট দেখা যায়। ইহাই আমরা সকলে জানি। কিন্তু দুই রকম আলোতে মিলিয়া যে অন্ধকারের সৃষ্টি করিতেছে, ইহা প্রায়ই আমাদের নজরে পড়ে না। সর্ব্বদা নজরে না পড়িলেও কিন্তু ইহা সত্য। তাহাই তোমাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বিষয়টি আলোচনা করিবার আগে আলো ও রঙ সম্পর্কে খুব জানাশুনা কয়েকটি ব্যাপার তোমাদের মনে করাইয়া দিব। সরিষার তেল যখন শিশিতে থাকে, তখন তাহাকে একটু হলদে দেখায়। কিন্তু যেই তাহার এক বিন্দু জলে পড়ে অমনি রামধনুর মতো নানা রঙ্ জলের উপরে দেখা যায়। কেবল সরিষার তৈল নয়, রেড়ি তিসি তার্পিন কেরোসিন পেট্রোল যে-কোনো তেল জলে পড়িলে ঐরকম রঙের খেলা দেখা যায়। তোমরা ছেলে-বেলায় সাবান-জল বা ভেরাণ্ডার আঠার বুদ্বুদ করিয়া হয়ত খেলা করিয়াছ। যখন বুদ্বুদগুলি বড় হইয়া দাঁড়ায় তখন তাহার উপরে কি-রকম সুন্দর রঙ্ প্রকাশ পায়, তোমরা দেখ নাই কি? সাবান-জলের বুদ্বুদ তৈয়ার করিয়া তোমরা ইহা পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, জলে তেল পড়িলে যে-রকম রঙ্ দেখা যায়, সাবান-জলের বুদ্বুদের গায়ে অবিকল সেই রকম রঙ্ দেখা যাইতেছে।

এই সকল রঙ্ কি-রকমে হয়, আগে তাহা জানা ছিল না। ইংলণ্ডের মহাপণ্ডিত নিউটন্ সাহেবই ইহা লইয়া প্রথমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বুড়ো নিউটন যখন সাবানের বুদ্বুদ তৈয়ারী করিয়া তাহার রঙ্ পরীক্ষা করিতেন, তখন বোধ করি ছোটো ছেলেরা এই খেলা দেখিয়া হাসিত। কিন্তু এই বুদ্বুদের পরীক্ষায় আলো সম্বন্ধে যে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা শুনিলে তোমরা আশ্চর্য্য হইবে।

তোমরা সকলেই জানো, সূর্য্যের সাদা আলো বিশ্লিষ্ট হইলে লাল, অরুণ, হলুদ, সবুজ প্রভৃতি নানা রঙিন আলো বাহির হইয়া পড়ে। ঈথরের যে-সব ঢেউ হইতে এই রঙিন্ আলোগুলি উৎপন্ন হয়, তাহাদের দৈর্ঘ্য সমান নয়। লালের ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য সব চেয়ে বড় এবং বেগুনের ঢেউ সব চেয়ে ছোটো ; অরুণ, হলুদ, সবুজ, নীল প্রভৃতি রঙের ঢেউ এই দুইয়ের মাঝারি রকমের। আমরা এই সব কথা জানি, কিন্তু আগেকার লোকে এ-সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। নিউটন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সাবানের বুদ্বুদ পরীক্ষা করিয়া এবং অনেক অঙ্ক কষিয়া ইহার গোড়া পত্তন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে দেখ, সাবানের বুদ্বুদ সামান্য জিনিস নয়।

যাহা হউক, বুদ্বুদ পরীক্ষা করিয়া কি জানা গিয়াছিল এখন দেখা যাউক। বুদ্বুদের গায়ে যে নানা রঙ্ দেখা যায়, সেগুলি যে সূর্য্যেরই সাদা আলো হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। কি-রকমে সূর্য্যের আলো বিশ্লিষ্ট

হইয়া এই রঙ্গুলি প্রকাশ করে, তাহাই তোমাদিগকে বলিব। আম, কাঁঠাল, লেবু প্রভৃতি ফলের শাঁস খোসা দিয়া ঢাকা থাকে। আমরা যখন ফল খাই, তখন খোসা ফেলিয়া দিই। আমের খোসা পাত্‌লা, লেবুর ও কাঁঠালের খোসা খুব পুরু। খোসা পাত্‌লাই হউক বা পুরু হউক তাহার দুইটা পিঠ থাকে। একটা উপরকার পিঠ এবং আর একটা নীচেকার পিঠ। যে-খোসা বা জলের আবরণ দিয়া বুদ্বুদের ভিতরকার বাতাস ঢাকা থাকে তাহা খুবই পাত্‌লা। তবুও তাহার ঐ রকম উপরকার এবং নীচেকার পিঠ আছে। মনে কর, যেন সূর্য্যের আলোর একটি রশ্মি বুদ্বুদের উপরকার পিঠে আসিয়া ঠেকিল। এখন এই রশ্মিটির অবস্থা কি হইবে বলা যায় না কি? বুদ্বুদের খোসার উপরের পিঠে ঠেকিয়া ইহার কতকটা প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে আরম্ভ করিবে; আর কতকটা খোসার ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার নীচেকার পিঠে প্রতিফলিত হইবে এবং তা'র পরে ফিরিয়া যাইতে থাকিবে। সূর্য্যের রশ্মির যে দুই অংশ খোসার উপর ও নীচের পিঠে প্রতিফলিত হইয়া বাহিরে আসে, তাহাই বুদ্বুদের গায়ে আলো দেখায়। কি-রকমে দেখায়, একটা উদাহরণ দিলে বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিবে। মনে কর, একই রশ্মি দুই ভাগে ভাগ না হইয়া যেন দুইটা রশ্মি বুদ্বুদের খোসার উপর পিঠে ও নীচের পিঠে প্রতিফলিত হইয়া তোমার চোখে আসিবার জন্য ছুটিয়া চলিতেছে। এই রশ্মি দুইটার ছুটিয়া চলার সঙ্গে তোমাদের ড্রিলের সময়কার সমানভাবে পা ফেলিয়া চলার তুলনা

করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, তোমাদের মধ্যে অণু ও রেণু দুই ভাই ঠিক্ এক ফুট্ অন্তরে পা ফেলিয়া এবং পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যেন ড্রিল করিতেছ। দু'জনের পা ঠিক্ তালে তালে পড়িতেছে। একটু দূরে তাহাদেরই সম্মুখে দুইটা খুঁটি এক ফুট অন্তরে পোঁতা আছে। অণুকে বলা গেল, "তুমি প্রথম খুঁটি ছুঁইয়াই যে-পথে চলিয়াছ, ঠিক সেই পথেই ফিরিবে।" রেণুকে বলা হইল, "প্রথম খুঁটির পিছনে যে দ্বিতীয় খুঁটি আছে তাহা ছুঁইয়া তুমিও যে-পথে চলিতেছ ঠিক্ সেই-পথেই ফিরিবে।" মনে রাখিয়ো, খুঁটি দুইটি এক ফুট অন্তরে পোঁতা আছে, এবং অণু, রেণু দুই ভাই তালে তালে এক ফুট অন্তরে পা ফেলিয়া খুঁটি ছুঁইতে চলিয়াছে। খুঁটি ছুঁইবা মাত্র তাহারা ফিরিবে। অণু প্রথম খুঁটি ছুঁইয়া ফিরিল। রেণু কিন্তু ফিরিতে পারিল না। সে প্রথম খুঁটি ছাড়িয়া দ্বিতীয় খুঁটি ছুঁইয়া ফিরিল। ইহাতে কি হইল ভাবিয়া দেখ। অণু আগে চলিতে লাগিল এবং রেণু দ্বিতীয় খুঁটি ছুঁইতে যে বিলম্ব করিল, তাহাতে পিছাইয়া পড়িল। কিন্তু তাহাদের পা ঠিক্ আগের মতো তালে তালেই পড়িতে লাগিল। কারণ, খুঁটি দুইটার অন্তর এক ফুট এবং তাহাদের পদক্ষেপও এক ফুট। কাজেই, একবার বেশি পা ফেলিয়া রেণু খুঁটি ছুঁইল এবং আর একবার পা ফেলিয়া সে ফিরিতে সুরু করিল। ইহাতে সে দুই পা পিছাইয়া পড়িল বটে, কিন্তু দু'জনের পা ফেলার তাল ভঙ্গ হইল না। কিন্তু খুঁটি দুইটির অন্তর যদি $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}$ ফুট বা ঐরকম একটা-কিছু হইত, তাহা

হইলে রেণু দ্বিতীয় খুঁটিকে ছুঁইয়া ফিরিবার সময়ে অণুর সঙ্গে তাল রাখিয়া পা ফেলিতে পারিত না।

এখন বুদ্বুদ ও তাহার আবরণের কথা মনে কর। বুদ্বুদের আবরণ অর্থাৎ খোসার স্থূলতা যদি কোনো আলোর ঢেউয়ের দৈর্ঘ্যের সমান হয়, তবে আলোর যে-দুই অংশ বাহিরের পিঠে এবং ভিতরের পিঠে প্রতিফলিত হইয়া ফিরিল, তাহারা ঠিক্ তাল রাখিয়া চলিতে পারিবে। কিন্তু আবরণের স্থূলতা যদি ঢেউয়ের দৈর্ঘ্যের $\frac{1}{2}$ বা $১\frac{1}{2}$ এই রকম কিছু থাকে, তবেই মুস্কিল হয়। তখন দুই ঢেউ পরস্পর তাল রাখিয়া চলিতে পারে না। অর্থাৎ তখন একটা ঢেউয়ের উঁচু অংশ, অন্য ঢেউয়ের নীচু অংশের সঙ্গে মিলিয়া যায়। ইহাতে দুই ঢেউ পরস্পর কাটাকুটি করিয়া নষ্ট হয়। কাজেই, সেখানে ঈথরের ঢেউ থাকে না এবং ঈথরের ঢেউ থাকে না বলিয়া আলোও দেখা যায় না। সুতরাং আলোতে আলোতে অন্ধকার হওয়ার কথাটা মিথ্যা নয়। জলের ঢেউয়ে এই রকম কাটাকুটি তোমরা লক্ষ্য কর নাই কি? মনে কর, তোমাদের মধ্যে দু'জনে স্নানের সময়ে হাতের ঠেলা দিয়া জলে ঢেউ তুলিতেছ। যেখানে দুই ঢেউয়ের অবিকল মিল থাকিবে, সেখানকার ঢেউগুলির খুব জোরে উঠানামা দেখা যাইবে। কিন্তু যেখানে একটি ঢেউয়ের চূড়া আর একটি ঢেউয়ের নীচু অংশের সহিত মিলিয়া যাইবে, সেখানে ঢেউয়ের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। এই রকমেই এক আলোর ঢেউ অন্য আলোর ঢেউয়ের সঙ্গে মিলিয়া অন্ধকার দেখায়।

জলের উপরকার তেলে বা বুদ্বুদের উপরকার আবরণে কেন লাল সবুজ নীল প্রভৃতি রঙ্ দেখা যায়, এখন তোমরা বুঝিতে পারিবে। সূর্য্যের সাধারণ আলোর ভিতরে যে-সব রঙিন আলো আছে, তাহাদের ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য সমান নয়। বুদ্বুদের আবরণের দুই পিঠে প্রতিফলিত হইয়া যে-সব রঙের ঢেউ কাটাকুটি না যায়, সেগুলিকে আমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া স্পষ্ট দেখিতে পাই; যেগুলির ঢেউ কাটাকুটি যায় তাহাদের মোটেই দেখা যায় না। কাজেই, নানা রঙ্‌কে আমরা বুদ্বুদের গায়ে স্তরে স্তরে সাজানো দেখি। জলের উপরে তেল ভাসিতে থাকিলে যে-সব রঙ্ দেখা যায় সেগুলিও ঠিক্ এই রকমেই উৎপন্ন হয়। সূর্য্যের সাদা আলো তেলের পর্দ্দায় পড়ে। তাহার কতকটা তেলের পিঠ হইতে প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসে। আবার কতক তেল ভেদ করিয়া জলের পিঠে ঠেকে এবং সেখান হইতে প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসে। কিন্তু তেলের পর্দ্দার স্থূলতা এবং আলোর ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য উভয়ই খুবই অল্প। তাই তেলের ওপিঠের ঢেউ, এপিঠের প্রতিফলিত আলোর ঢেউয়ের তুলনায় একটু পিছাইয়া পড়ে। ইহাতে যখন একটা ঢেউয়ের চূড়া আর একটার নীচু অংশের সঙ্গে মিলিয়া যায়, তখন দুইয়ে কাটাকুটি হয়। ফলে হইয়া দাঁড়ায় আলোতে আলোতে অন্ধকার।

তোমাদের জামায় যে ঝিনুকের বোতাম লাগানো থাকে, আলোতে ধরিলে তাহাতে কেমন সুন্দর রঙ্ দেখা যায়, তাহা বোধ করি তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ। ইহাও আলোর ঢেউয়ের কাটাকুটিতে উৎপন্ন হয়। ঝিনুকের গায়ে সেই-সব রঙ্ লাগানো থাকে না।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র

আলো-সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমাদিগকে একে একে বলিলাম। এখন আলো-সংক্রান্ত যে সব যন্ত্র আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, সেগুলির একটু পরিচয় দিব।

প্রথমে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কথা বলা যাউক। যে যন্ত্রের সাহায্যে ছোটো জিনিসকে খুব বড় করিয়া দেখা যায়, তাহাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope) বলা হয়। আজকালকার ডাক্তারদের কাছে প্রায়ই এই যন্ত্র থাকে। তোমরা ইহা দেখ নাই কি?

পরপৃষ্ঠায় সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের একটা ছবি দিলাম। ইহার "দ" চিহ্নিত জায়গায় কুব্জপৃষ্ঠ পরকলা থাকে। এই পরকলাকে দৃষ্টিখণ্ড (Eye-piece) বলা হয়। বস্তুখণ্ডের নীচে যে সেল্‌ফের মতো অংশটি আছে, তাহা দেখ। যে জিনিসকে বড় করিয়া দেখার প্রয়োজন, সেটিকে এই সেল্‌ফের উপরে রাখা হয় এবং সব তলায় যে গোলাকার আয়না রহিয়াছে তাহাকে ঘুরাইয়া জিনিসটির উপরে আলো ফেলা হয়। যন্ত্রে ছোটো জিনিসের যে-বড় ছবি দেখা যায়, বেশি আলো পাইলে তাহা এই রকমেই সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে।

এখন কি করিয়া এই যন্ত্রে ছোটো জিনিসকে বড় দেখায় খোঁজ লওয়া যাউক। তোমরা আগেই দেখিয়াছ, কুব্জপৃষ্ঠ পরকলার প্রধান অধিশ্রয়ের বাহিরে কোনো জিনিস রাখিলে

তাহার একটা উল্টা প্রতিবিম্ব পরকলার ওপিঠে পড়ে। এখানে ঠিক্ তাহাই ঘটে। যে জিনিসটাকে বড় করিয়া দেখিতে চাই, তাহাকে আমরা বস্তুখণ্ডের প্রধান অধিশ্রয়ের বাহিরে রাখি। কাজেই, তাহার একটি উল্‌টা প্রতিবিম্ব হয়। কিন্তু যেখানে-সেখানে
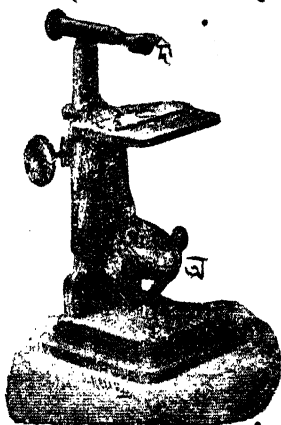
হয় না; দৃষ্টিখণ্ডে যে কুব্জপৃষ্ঠ পরকলা আছে তাহারি প্রধান অধিশ্রয়ের ভিতরের দিকে হয়। তোমরা আগেই দেখিয়াছ, পরকলার এবং প্রধান অধিশ্রয়ের মাঝে কোনো জিনিস বা প্রতিবিম্ব পড়িলে ভয়ানক বড় হয়। কাজেই, সেই ছায়াময় প্রতিবিম্ব প্রধান অধিশ্রয় ও পরকলার মাঝে পড়ায় দৃষ্টিখণ্ডে চোখ রাখিলে তাহাকে অত্যন্ত বড় দেখায়। ইহাই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মোটামুটি কাজ। শক্তি বাড়াইবার জন্য খুব ভালো যন্ত্রের দৃষ্টিখণ্ডে দুই বা তিনখানি করিয়া পরকলা একত্র রাখা হয়। ইহাতেই কোনো ছোটো জিনিসকে পরীক্ষা করিলে অসম্ভব বড় দেখায়।

বুড়ারা যে আতসী কাচ বা চশমা দিয়া বই পড়েন, তাহাকেও এক রকম অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলা যাইতে পারে। ইহাতেও ছোটো জিনিসকে বড় দেখায়। আতসী কাচ ও বুড়াদের চশমা কুব্জপৃষ্ঠ পরকলা ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাই পরকলা ও তাহার প্রধান অগ্নিশ্রয়ের মাঝের কোনো জায়গায় বই ধরিলে অক্ষরগুলিকে খুব বড় দেখায়। দেখ, ছোটোকে বড় করিয়া দেখার উপায় কত সহজ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ছয়-সাত শত বৎসর আগেকার লোকে চশমা বা আতসী কাচের ব্যবহার জানিত না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈয়ারীর কৌশলও খুব অল্প দিন হইল জানা গিয়াছে। আড়াই শত বৎসর আগেকার লোকেও এই যন্ত্রসম্বন্ধে কিছুই জানিত না।

যাহা হউক, এই ছোটো যন্ত্রটিদ্বারা অল্প সময়ে বিজ্ঞানের যে কত উন্নতি হইয়াছে তাহা বলিয়াই শেষ করা যায় না। প্রাণী ও গাছপালার শরীরে এমন অনেক অংশ আছে, যাহা খালি চোখে নজরে পড়ে না। বৈজ্ঞানিকেরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া সেগুলিকে দেখিয়া প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের কাজের অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র

দূরবীক্ষণ যন্ত্র অর্থাৎ দূরবীন্ (Telescope) তোমরা দেখ নাই কি? এই যন্ত্রে দূরের জিনিসকে খুব বড় আকারে কাছে দেখা যায়। গ্রহ-নক্ষত্রেরা পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে। কিন্তু দূরবীন্ দিয়া দেখিলে তাহাদিগকেই খুব বড় আকারে কাছে দেখা যায়। তোমরা যদি কখনো এই যন্ত্র হাতের গোড়ায় পাও, তবে চাঁদ, শুক্র, শনি, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহদের ইহা দিয়া দেখিয়ো। চাঁদের উপরে যে, পাহাড়-পর্ব্বত আছে, শনিকে ঘিরিয়া যে বলয় আছে এবং বৃহস্পতিকে ঘিরিয়া যে উপগ্রহগুলি ঘুরপাক খায়, সকলি দেখিতে পাইবে। আজকালকার পণ্ডিতদের কাছে গ্রহ-নক্ষত্র-সম্বন্ধে যে-সব খবর জানা যায়, তাহার অধিকাংশই দূরবীনের সাহায্যে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

যাহা হউক পরপৃষ্ঠায় দূরবীনের একটা ছবি দিলাম। কি কৌশলে ইহা দিয়া খুব দূরের জিনিসের ছবি কাছে আনা যায়, তাহা তোমাদিগকে বলিব। ইহার গঠন মোটেই জটিল নয়। ছবিতে যে মোটা নলটি দেখিতেছ, তাহার দুই প্রান্তে দুইখানি কুব্জপৃষ্ঠ পরকলা থাকে। যে-প্রান্তে চোখ লাগাইয়া দূরের জিনিস দেখিতে হয়, সেখানকার পরকলা ছোটো। এই অংশকে দৃষ্টিখণ্ড (Eye-piece) বলা হয়। ছবিতে উহা 'ক' চিহ্নিত করা রহিয়াছে। অপর প্রান্তের 'খ' চিহ্নিত পরকলা কিন্তু খুব

বড়। যন্ত্রের যে-অংশে ইহা লাগানো থাকে, তাহাকে বলা হয় বস্তুখণ্ড (Object glass)।

বস্তুখণ্ডের পরকলা দ্বারা বাহিরের জিনিসের ছোটো প্রতিবিম্ব নলের ভিতরে আনা হয়। তা'র পরে দৃষ্টিখণ্ডের পরকলাই সেই ছোটো প্রতিবিম্বকে খুব বড় করিয়া দেখায়। দূরবীক্ষণের বস্তুখণ্ড অর্থাৎ 'খ' পরকলা যত বড় হয়, দূরের জিনিস ততই বড় দেখায়। এই জন্য বড় দূরবীনে ঐ পরকলার ব্যাস খুব বড় থাকে।
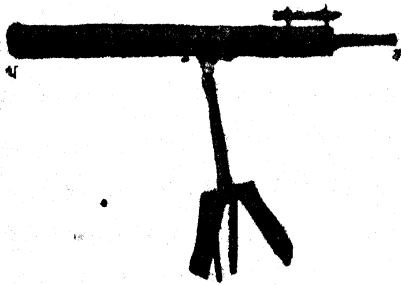
কোনো কোনো দূরবীনে দুই হাতের বেশি ব্যাসেরও পরকলা দেখা গিয়াছে। আমেরিকার লিক্ মানমন্দিরের দূরবীনটির ব্যাস দুই হাত। আবার মিচিগান মানমন্দিরে যে দূরবীন্ আছে তাহার ব্যাস প্রায় চল্লিশ ইঞ্চি, অর্থাৎ দুই হাতেরও বেশি। কিন্তু এই-সব পরকলার কুব্জতা খুব অল্প রাখা হয়। যে দূরবীনে বস্তুখণ্ডের কুব্জতা কম এবং দৃষ্টিখণ্ডের কুব্জতা বেশি, তাহাতেই ভালো কাজ

পাওয়া যায়। তাই কুব্জতা বাড়াইবার জন্য দৃষ্টিখণ্ডে অনেকগুলি পরকলা পর পর সাজানো থাকে।

কে কবে কি-রকমে অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছিল, তাহার সব খবর জানা যায় না। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবন সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া হায়। একটা গল্প বলি। অনেক দিন আগে ডেন্‌মার্কে এক বুড়া চশমাওয়ালা ছিল। চশমার জন্য তাহার দোকানে নানা রকম কাচের পরকলা থাকিত। একদিন তাহার ছোটো ছেলেরা পরকলা চোখে দিয়া খেলা করিতে করিতে দেখিল, দু'খানা পরকলার ভিতর দিয়া দূরের জিনিসকে লক্ষ্য করিলে জিনিসটাকে যেন কাছে আসিতে দেখা যায়। এই নূতন খেলায় তাহাদের খুব আনন্দ হইল। তাহারা পাড়ার ছেলেদের ডাকিল এবং পরকলা সাজাইয়া দূরের গাছ-পালা ও ঘর-বাড়ি-গুলিকে দেখিতে লাগিল। এই নূতন খেলার কথা যখন বুড়া চশমাওয়ালার কানে গেল, তখন সে স্থির থাকিতে পারিল না। সে ছেলেদের কাছে দৌড়াইয়া গিয়া দেখিল সত্যই তাহারা একটা আশ্চর্য্য খেলা আবিষ্কার করিয়াছে। তা'র পরে সে দোকানে ফিরিয়া একটা নলের ভিতরে দু'খানা পরকলা লাগাইয়া একটি দূরবীন তৈয়ার করিয়া ফেলিল। ইহাই পৃথিবীর প্রথম দূরবীন। গ্যালিলিয়োর নাম বোধ করি তোমরা শুন নাই। তিনি ইটালির একজন বড় জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। এক বুড়া চশমাওয়ালা একটা অদ্ভুদ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে শুনিয়া গ্যালিলিয়োও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন দূর দেশে

যাইবার জন্যে রেল বা ষ্টীমার ছিল না। বহু কষ্টে ডেনমার্কে গিয়া যন্ত্রটি দেখিয়া আসিয়াছিলেন এবং দেশে ফিরিয়া একটা বড় দূরবীন তৈয়ারি করিয়াছিলেন। আজকাল আমরা দূরবীন দিয়া যে চাঁদের পাহাড় ও বৃহস্পতির উপগ্রহ দেখিতে পাই, গ্যালিলিয়োই তাঁহার সেই দূরবীন দিয়া সকলের আগে সেগুলিকে দেখিয়াছিলেন।

ফোটোগ্রাফের ক্যামেরা

তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয় ত ফোটোগ্রাফের ছবি তুলিয়াছ। ছবি তুলিবার জন্য ছবিওয়ালা যে বাক্সের মতো যন্ত্রটি সঙ্গে আনেন তাহারি নাম ক্যামেরা (Camera) তোমরা বোধ করি মনে কর, ক্যামেরার মধ্যে না জানি কত জটিল কল আছে। কিন্তু তাহা নয়। ইহার মতো সরল যন্ত্র আর নাই।

এখানে ক্যামেরার একটা ছবি দিলাম। দেখ, একটা তে-পায়ার উপরে ক্যামেরা দাঁড় করানো আছে। যন্ত্রটি একটি বাক্স ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহার মুখে একটা কুব্জপৃষ্ঠ
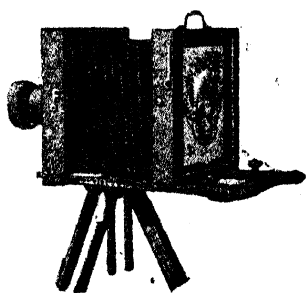
পরকলা ঢাক্‌নিতে ঢাকা থাকে। যদি তোমাদের কয়েক জনকে সাম্‌নে বসাইয়া ক্যামেরার পরকলার ঢাক্‌নি খোলা যায়, তাহা হইলে কি হয় বলা যায় না কি? পরকলাখানি কুব্জপৃষ্ঠ। কাজেই, তোমাদের সকলের একটা ছোটো উল্‌টা প্রতিবিম্ব ক্যামেরার

পিছনে পড়ে। দেখ, পূর্ব্বপৃষ্ঠায় যে ছবি রহিয়াছে, তাহাতে সেই রকমের একটা প্রতিবিম্ব ক্যামেরার পিছনে দেখা যাইতেছে। ভিতরটাকে অন্ধকার রাখিবার জন্য ক্যামেরার পিছনে কাঠ দেওয়া থাকে। সেই কাঠখানিকে উঠাইয়া সেখানে একখানি ঘষা কাচ দেওয়া হইয়াছে। তাই কাচের উপরে বাহিরের লোকটির উল্‌টা ছবি পড়িয়াছে।

ক্যামেরার পিছনে কাচের উপরে এই যে-ছবি পড়ে, তাহা স্থায়ী নয়। বাহিরের লোক অন্যত্র সরিয়া গেলে বা ক্যামেরার মুখ বন্ধ করিলে সে-ছবি থাকে না। কাচের উপরকার ছবিটাকে স্থায়ী করার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা আছে। বাজারে এক রকম রাসায়নিক প্রলেপ দেওয়া কাচ (Photographic plate) বিক্রয় হয়। ছবি-ওয়ালা সেই কাচ ক্যামেরার পিছনে লাগাইয়া তাহার উপরে বাহিরের লোকজন ও গাছ-পালার প্রতিবিম্ব ফেলেন। প্রলেপ লাগানো এই কাচের বিশেষ গুণ এই যে, তাহার যেখান-টায় সূর্য্যের আলো লাগে, সেখানটা বিকৃত হইয়া যায়। কাজেই যখন বাহিরের জিনিসের আলোকময় প্রতিবিম্ব সেই কাচে পড়ে, তখন প্রতিবিম্বের জায়গাটা বিকৃত হইয়া যায়। কিন্তু কোন্ অংশ বিকৃত হইল, তাহা চোখে দেখিয়া জানা যায় না। ছবি-ওয়ালা যখন সেই কাচখানিকে কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য মিশানো জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখেন, তখন প্রতিবিম্বের আলো পাইয়া যে-অংশ বিকৃত হইয়াছে সেখান হইতে প্রলেপ উঠিয়া যায়। ইহাতে পূর্ব্বের প্রতিবিম্বের মতো একটা স্থায়ী ছবি কাচে

ফুটিয়া উঠে। এই ছবিকে ফোটোগ্রাফ-ওয়ালারা "নেগেটিভ্" বলেন।

নেগেটিভ্ তৈয়ারি হইলে ফোটোগ্রাফের ছবি তোলার অনেক কাজ শেষ হইয়া যায়। তখন ছবিওয়ালা ফোটোগ্রাফের কাগজ সংগ্রহ করেন। এই কাগজের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, তাহার যেখানটায় সূর্য্যের আলা লাগে, সেখানটা কালো হইয়া যায়। তাই কাগজগুলিকে সাবধানে জড়াইয়া নলের ভিতরে অন্ধকারে রাখিতে হয়। যাহা হউক, ছবিওয়ালা এই কাগজগুলিকে ছোটো করিয়া কাটিয়া নেগেটিভ্ কাচের তলায় রাখেন এবং কাচের উপরে সূর্য্যের আলো ফেলিতে থাকেন। কাজেই, নেগেটিভের যে-সব অংশের প্রলেপ উঠানো থাকে, সেই-সব জায়গা দিয়া সূর্য্যের আলো প্রবেশ করিয়া তলাকার কাগজের উপরে পড়ে। ইহাতে নেগেটিভে যে-ছবি আছে, তাহারি মতো একটা কালো ছবি কাগজে আঁকিয়া যায়। ইহার পরে ছবিওয়ালা সেই কাগজখানিকে নানা রাসায়নিক জিনিসে ডুবাইয়া ছবিটিকে পাকা করিয়া রাখেন। ইহাই ফোটোগ্রাফের ছবি। তাহা হইলে দেখ, একখানা "নেগেটিভ্" তৈয়ারি করিতে পারিলে তাহার তলায় ফোটোগ্রাফের কাগজ দিয়া যত খুসি ছবি তৈয়ারি করা যাইতে পারে।

আমাদের চোখ

মানুষ জ্ঞান ও বুদ্ধির বলে অনেক যন্ত্র গড়িয়াছে কিন্তু আমাদের চোখের মতো এমন সুন্দর যন্ত্র বোধ করি এপর্যান্ত কেহই গড়িতে পারে নাই। চোখের অনেক স্বাভাবিক দোষ আছে সত্য, কিন্তু সে-সব দোষের সঙ্গে মানুষের হাতে-গড়া যন্ত্রের ক্রুটির তুলনা করিলে সেগুলিকে দোষ বলিয়াই মনে হয় না। কেমন করিয়া মানুষের দেহে আপনা হইতেই এমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর যন্ত্রের সৃষ্টি হইল, তাহা ভাবিয়াই ঠিক্ করা যায় না। মনে হয়, যেন কোনো যন্ত্রী বহু বৎসর গভীর চিন্তার পরে সুকৌশলে চক্ষুযন্ত্র তৈয়ার করিয়া আমাদের মাথায় লাগাইয়া দিয়াছেন। ভালো করিয়া চারিদিকের জিনিসকে অনায়াসে দেখার জন্য আমাদের চোখে যে-সকল ব্যবস্থা আছে, তাহার কথা শুনিলে তোমরা অবাক্ হইয়া যাইবে।

যন্ত্র তৈয়ার করিলেই হয় না। যাহাতে ব্যবহারের সময়ে হঠাৎ নষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থা রাখাও দরকার। ঘড়িওয়ালা স্প্রিং দিয়া চাকা দিয়া অনেক কৌশলে ঘড়ি তৈয়ারী করে। ঘড়ি টিক্‌টিক্ করিয়া দিবারাত্রি চলিতে থাকে। এখন ঘড়ির এই কলটিকে যদি একটা মজবুত কৌটার মধ্যে না পুরিয়া পকেটে রাখা যায় বা হাতে বাঁধা যায়, তাহা হইলে কল কি ভালো থাকে? কখনই থাকে না। তখন সামান্য আঘাতে ঘড়ি বিগ্‌ড়াইয়া যায়।

তাই খড়িওয়ালা ঘড়ি তৈয়ারি করিয়া একটা সোনা বা রূপার ঢাক্‌নির ভিতরে কলটিকে রাখেন। ইহাতে হঠাৎ আঘাত পাইয়া কল নষ্ট হয় না। আমাদের চোখের গঠন ঘড়ির চেয়েও সূক্ষ্ম ও জটিল। তাই হঠাৎ আঘাত পাইলে সেটি যাহাতে নষ্ট না হয়, তাহার সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

নাক বা কান যেমন মাথার উপরে লাগানো থাকে, চোখ সে-রকমে লাগানো থাকে না। চোখ্ থাকে, মাথার হাড়ের দুইটা গর্ত্তের মধ্যে। তাই ক্রিকেট খেলা বা ঘুঁষাঘুঁষি (Boxing) অভ্যাস করার সময়ে যখন চোখের কাছে আঘাত লাগে, তখন চক্ষু-কোটরের উঁচু হাড়ই চোখ্‌কে রক্ষা করে। চোখের উপরেই ঘন লোমওয়ালা ভ্রূ আছে। তোমরা বোধ হয় মনে কর, চোখের শোভা বৃদ্ধির জন্য ইহা থাকে। কিন্তু তাহা নয়। কপালের ঘাম গড়াইয়া যাহাতে চোখের ভিতরে আসিতে না পারে, তাহারি জন্য এই ব্যবস্থা। বৃষ্টির জলের ছাট যাহাতে ঘরে না আসিতে পারে, তাহার জন্য ঘরের সম্মুখে আমরা বারান্দা রাখি। বারান্দার চালে যে-খড় থাকে, তাহাই বৃষ্টি নিবারণ করে। ভ্রূর কাজ কতকটা বারান্দার খড়ের মতো নয় কি? ভ্রূ না থাকিলে কপালের ঘামে চোখের হানি হইত। চোখের পাতাও একটা অদ্ভুত বস্তু। তাহাতে যে সারি সারি লোম লাগানো থাকে, তাহা ধূলামাটি বা ছোটো পোকামাকড় চোখে পড়িতে দেয় না। এই-সব আবর্জ্জনা চোখের কাছে উড়িয়া আসিলেই লোমে আট্‌কাইয়া যায়। তা ছাড়া চোখের পাতায় যে-সব স্নায়ু ও পেশী লাগানো আছে,

তাহারো কাজ আশ্চর্য্যজনক। কোনো অনিষ্টকর জিনিস চোখের কাছে আসিলেই সেই সকল স্নায়ু ও পেশী আপনা হইতেই উত্তেজিত হইয়া দুই পাতা দিয়া চোখ্‌কে ঢাকিয়া ফেলে। তোমরা বোধ হয়ে মনে কর, খেলার সময়ে যখন চোখের কাছে বল্ ছুটিয়া আসে, তখন তোমরাই ইচ্ছা করিয়া চোখ বন্ধ কর। কিন্তু তাহা নয়। আঘাতের সম্ভাবনা হইলেই চোখের স্নায়ু আপনিই উত্তেজিত হইয়া পাতা দুইটিকে বন্ধ করে। এ-রকম স্থলে তোমাদের ইচ্ছার দ্বারা কোনো কাজ হয় না।

এত সুব্যবস্থা থাকিলেও চোখে প্রায়ই ধূলিকণা ও অন্য আবর্জ্জনা পড়ে। ইহাতে চোখ খারাপ হয়। তাই চোখের ভিতরটাকে ধুইয়া ফেলিবার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা আছে। দুই চোখেরই বাহির দিকের কোণে এক একটা খুব ছোটো নল লাগানো থাকে। ধূলার কণা বা কয়লার গুঁড়া চোখে পড়িলেই সেই নলের তলাকার থলি উত্তেজিত হইয়া আপনিই এক রকম নোনা জল বাহির করে। এই জলে চোখের ভিতরকার ধূলামাটি ধুইয়া চোখের অন্য কোণে যে আর একটা নল লাগানো থাকে, তাহার ভিতরে প্রবেশ করে এবং শেষে তাহা নাক দিয়া বাহির হইয়া যায়। বাড়ির নোংরা জল বাহির করার জন্য যেমন নর্দ্দামা থাকে, চোখের ভিতর দিকের কোণার নল যেন সেই রকম নর্দ্দামা। চোখের ময়লা-মাটি-ধোয়া জল সেই নর্দ্দামা দিয়া নাকে পোঁছায় এবং আমরা নাক ঝাড়িয়া তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিই। দেখ, কেমন সুব্যবস্থা। কেবল ইহাই নয়। নোনা জলে

আমাদের চোখ ভালো থাকে। নদী বা পুষ্করিণীতে স্নানের সময় তোমরা ইহার পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, ডুব দিয়া চোখ্ খুলিলেই চোখ দু'টা যেন কট্‌কট্ করে। চোখে নদী ও পুষ্করিণীর ভালো জল লাগে বলিয়াই ইহা ঘটে। তোমরা সমুদ্রে স্নান করিয়াছ কি না জানিনা। সমুদ্রে ডুব দিয়া চোখ্ খুলিলে চোখ্ কট্‌কট্ করে না। কারণ সমুদ্রের জল লোনা। তাহা হইলে বলিতে হয়, চোখ্‌কে ভালো রাখিবার জন্যই চোখ্ হইতে লোনা জল বাহির হয়।

চোখ্ দু'টিকে সুস্থ ও নিরাপদ্ রাখার জন্য বাহিরে যে-সব ব্যবস্থা আছে, তাহার কথা বলা হইল। ইহার ভিতরকার ব্যবস্থার কথা শুনিলে তোমরা আরো আশ্চর্য্য হইবে। একে একে সেই-সব কথাই এখন বলিব।

আমরা যখন তাকাইয়া থাকি, তখন চোখের উপরকার যে-অংশটাকে সাদা দেখায় তাহাকে শ্বেতাবরণ (Scelerotic) বলা হয়। ইহা অনচ্ছ এবং সম্মুখটা ছাড়া চোখের প্রায় সকল অংশই ইহাতে ঢাকা থাকে। সম্মুখের স্বচ্ছ আবরণটার নাম চক্ষুরাবরণ (Cornea) ইহা কাচের মতো স্বচ্ছ। ইহার ভিতর দিয়া আমরা চোখের তারাকে (Iris) দেখিতে পাই। চোখের তারা যে-জিনিস দিয়া তৈয়ারী হয় তাহা অনচ্ছ ও রঙিন। কাহারো তারা কালো, কাহারো নীল, কাহারো বা কটা। আমাদের দেশের প্রায় সকল লোকেরই চোখের তারা কালো। য়ুরোপের লোকদের তারার রঙ্ প্রায়ই কটা বা নীল। চোখের তারার ঠিক্ মাঝে

যে-একটি ছিদ্র দেখা যায়, তাহাকে বলা হয় চোখের মণি (Pupil)। আমাদের চোখের মণির আকৃতি গোল। কিন্তু সব প্রাণীর মণি গোল নয়। বিড়ালের চোখের মণি লম্বা। ইহা তোমরা দেখ নাই কি? তোমাদের পোষা বিড়ালটির চোখ্ পরীক্ষা করিয়ো, চোখের মণিকে লম্বা দেখিতে পাইবে। এই মণিই চোখের ভিতরে আলো যাইবার একমাত্র পথ। ইহা ছাড়া সেখানে অন্য পথ দিয়া আলো যাইতে পারে না। দরজার খুব ছোটো ছিদ্র দিয়া আমরা যেমন অন্ধকার ঘরে আলোর রেখা আনি, ইহা যেন ঠিক্ সেই রকমেরই ছিদ্র।

তোমরা বোধ হয় মনে কর, চোখগুলিকে সুন্দর দেখাইবার জন্যই আমাদের চোখে কালো তারা আছে। কিন্তু তাহা নয়। চোখের তারাই মণির ছিদ্রকে কখনো বড় বা কখনো ছোটো করে। একটা পরীক্ষার কথা বলি। তোমার চোখের তারা ও মণি কতটা বড় রাত্রিতে তাহা আয়নায় দেখিয়া লও। তা'র পরে চোখের সম্মুখে একটা উজ্জ্বল আলো রাখিয়া আবার আয়নায় চোখ্ পরীক্ষা কর। দেখিবে, উজ্জ্বল আলো পড়িবামাত্র চোখের তারাটি বড় এবং মণি ছোটো হইয়া গিয়াছে। বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! বেশি আলো পাইলে কেন চোখের মণি সঙ্কুচিত হয়, তাহা বোধ করি বুঝিতে পারিয়াছ। চোখের ভিতরে যাহাতে বেশি আলো যাইতে না পারে, তাহারি জন্য এই ব্যবস্থা। আর একটা পরীক্ষার কথা বলি। ঘোর অন্ধকার রাত্রি—ঘরে আলো জ্বালিয়া পড়িতেছ। এখন যদি তুমি হঠাৎ অন্ধকারে যাও, তবে

কি হয় দেখ নাই কি? অন্ধকারে কোনো জিনিসকেই কিছুক্ষণ ধরিয়া দেখা যায় না, কিন্তু একটু পরেই সব জিনিস নজরে পড়ে। কেন এমন হয় বলা কঠিন নয়। যখন আলোতে থাকি তখন আমাদের চোখের মণির ছিদ্র ছোটো থাকে। এই সময় হঠাৎ অন্ধকারে গেলে অন্ধকারে জিনিসপত্রের আলো সেই ছোটো ছিদ্র দিয়া চোখে আসিতে পারে না। কাজেই কোনো জিনিস নজরে পড়ে না। তার পরে কিছুক্ষণ অন্ধকারে থাকিলেই চোখের মণি বড় হইয়া যায়। তখন অন্ধকারের জিনিস নজরে পড়ে। কেবল ইহাই নয়, অন্ধকার হইতে আলোতে আসিলেও আমাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগে। ইহার কারণ হয় ত তোমরা এখন নিজেরাই বলিতে পারিবে। অন্ধকারে আমাদের চোখের মণি বড় থাকে। তাই হঠাৎ অন্ধকার হইতে আলোতে আসিলে মণির বড় ছিদ্র দিয়া অনেক আলো চোখে প্রবেশ করিয়া আমাদের ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয়। কিছুক্ষণ আলোতে থাকিলে মণি যখন আপনিই ছোটো হইয়া দাঁড়ায় তখন আর ধাঁধাঁ লাগে না।

চোখের ভিতরে আর কি-কি যন্ত্র আছে, এখন দেখা যাউক। পর পৃষ্ঠায় ছবিখানি দেখ। ছবিতে চোখের ভিন্ন ভিন্ন অংশ আঁকা আছে। "ক" "খ" চোখের তারা ইহারই পিছনে আছে, একখানি কুব্জপৃষ্ঠ পরকলা (Crystaline Lens) এবং তাহার পিছনে থাকে একটা কালো রঙের পর্দা (Retina)। দেখ, ছবিতে সেই পরকলা ও পর্দা "গ" এবং "ঙ" অক্ষর দিয়া দেখানো হইয়াছে। এগুলি ছাড়া অক্ষিগোলকের সবটাই দুই রকম স্বচ্ছ

তরল জিনিসে পূর্ণ দেখা যায়। এই স্বচ্ছ জিনিসের ভিতর দিয়া আলোর রশ্মি অবাধে চলিতে পারে। ছবির "ঘ" জায়গায় ঐ স্বচ্ছ জিনিস থাকে। পরকলা শুনিলেই কাচের পরকলার কথা আমাদের মনে পড়ে। বলা বাহুল্য, মণির পিছনে যে পরকলা
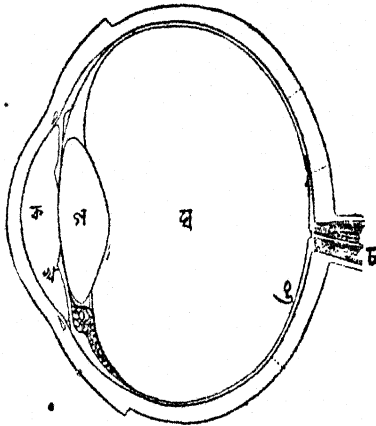
আছে, তাহা কাচের নয়। এক রকম ঘন তরল জিনিসই পরকলার আকারে চোখের ভিতরে থাকে।

ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার কথা তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি। তাহা যদি বুঝিয়া থাকো, তবে আমরা চোখ্ দিয়া কি-রকমে বাহিরের জিনিস দেখি তাহাও সহজে বুঝিতে পারিবে। আমাদের চোখেরই নকল করিয়া ক্যামেরা তৈয়ারি করা হইয়াছে। নকল জিনিস কখনই আসলের সমান হয় না। তাই ক্যামেরা চোখের মতো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই, তাহাতে অনেক

গলদ রহিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, ক্যামেরার কাজটা একবার মনে করিয়া দেখা যাউক। ইহাতে একটা কাচের পরকলা ঢাক্‌নি দিয়া ঢাকা থাকে। ঢাক্‌নির ছিদ্র দিয়া বাহিরের আলো পরকলায় আসিয়া পড়ে। আলো বেশি থাকিলে ছবিওয়ালা একটা স্ক্রু ঘুরাইয়া ছিদ্রটিকে ছোটো করিয়া দেন এবং আলো কম থাকিলে ছিদ্রকে বড় করেন। তা'র পরে সেই আলো পরকলায় বিবর্ত্তিত হইয়া ক্যামেরার পিছনকার কাচের পর্দ্দায় বাহিরের জিনিসের একটি প্রতিবিম্ব রচনা করে। কিন্তু সকল সময়ে এই প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হয় না। তাই ছবিওয়ালা আর একটা স্ক্রু ঘুরাইয়া পরকলাটিকে আগাইয়া বা পিছাইয়া তাহার অধিশ্রয়কে পিছনকার কাচের পর্দ্দায় ফেলেন। ইহাতে ছবি স্পষ্ট হয়। কাছের জিনিসের ছবি তুলিবার সময়ে পরকলা ও পর্দ্দার ভিতরকার দূরত্ব বেশি রাখিতে হয় এবং দূরের জিনিসের ছবি তুলিবার সময়ে সেই দূরত্বকে কমাইয়া ছোটো করিতে হয়। আমাদের চোখের গঠন ঠিক্ ক্যামেরারই মতো নয় কি? ক্যামেরায় যেমন কাচের পরকলা আছে, আমাদের চোখেও সেই রকম পরকলা আছে। ক্যামেরার পরকলায় যেমন আবশ্যক অনুসারে কম বা বেশি আলো ফেলিবার ব্যবস্থা আছে, আমাদের চোখের মণিতেও ঠিক্ সেই ব্যবস্থা আছে। কাজেই, ক্যামেরার পিছনকার কাচে যেমন বাহিরের জিনিসের প্রতিবিম্ব পড়ে, আমাদের চোখের পিছনকার কালো পর্দ্দাতেও অবিকল সেই রকম প্রতিবিম্ব পড়ে। তা'র পরে সেই প্রতিবিম্ব চোখের পর্দ্দাতে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে,

তাহা আগের সেই ছবিখানির "চ" চিহ্নিত স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে পৌঁছিলেই আমরা বাহিরের জিনিসকে দেখিতে পাই।

আমাদের চোখ্ দুইটা, এবং দুইটা চোখে দুইটা পৃথক্ পরকলা আছে। কাজেই, বাহিরের একই জিনিসের দুইটা পৃথক্ ছবি আমাদের চোখের পর্দ্দায় পড়ে। অথচ দেখিবার সময়ে আমরা একটার বেশি জিনিস দেখিতে পাই না। অর্থাৎ চোখে ছবি পড়ে দু'টা, কিন্তু দেখি একটা। ইহার কারণ বোধ করি তোমরা জানো না। এসম্বন্ধে পণ্ডিতেরা বলেন, আমাদের মস্তিষ্কের যে-অংশে দৃষ্টি-জ্ঞানের কেন্দ্র আছে সেখান হইতে দুই প্রস্ত স্নায়ু বাহির হইয়া একটা ডাইন চোখের এবং অপরটা বাঁ চোখের পিছনে আসিয়া ঠেকিয়াছে। দুই চোখে দুইটা ছবি পড়িলে ঐ স্নায়ুই ছবির অনুভূতিকে মস্তিষ্কের একই জায়গায় লইয়া যায়। ইহাতেই আমরা একই জিনিসের দুইটা ছবি না দেখিয়া একটামাত্র ছবি দেখি।

যাহা হউক, আমরা আগেই বলিয়াছি, ছবিওয়ালা কাছের জিনিসের ছবি তুলিবার সময়ে স্ক্রু ঘুরাইয়া ক্যামেরার পরকলাকে পর্দ্দা হইতে দূরে লইয়া যান এবং দূরের জিনিসের ছবির জন্য সেই রকমে পরকলাটিকে পর্দ্দার কাছে আনেন। ইহাতেই পর্দ্দার উপরে বাহিরের জিনিসের স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়ে। এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, আমাদের প্রত্যেক চোখে এক-খানির বেশি পরকলা নাই এবং সেই পরকলা আবার সকল সময়েই চোখের পিছনকার পর্দ্দা হইতে নির্দ্দিষ্ট দূরে থাকে। তবে কি-

রকমে কাছের ও দূরের জিনিসের ছবি সুস্পষ্ট চোখের পর্দ্দায় পড়ে? বাহিরের জিনিসের ছবি পর্দ্দায় স্পষ্ট করিয়া ফেলার জন্য চোখে যে ব্যবস্থা আছে, তাহার কথা শুনিলে তোমরা অবাক্ হইবে। কোনো বৈজ্ঞানিকই এ-পর্য্যন্ত ক্যামেরায় বা অন্য কোনো যন্ত্রে তাহার নকল করিতে পারেন নাই। তোমরা জানো, কুব্জপৃষ্ঠ পরকলার কুব্জতা যত বেশি হয়, ততই তাহার অগ্নিশ্রয় পরকলার কাছে পড়ে, এবং কুব্জতা যত অল্প হয়, অগ্নিশ্রয় ততই দূরে সরিয়া যায়। জমাট কাচের কঠিন পরকলার কুব্জতা ইচ্ছামত উঁচুনীচু করা যায় না, কিন্তু চোখের ভিতরে তরলপদার্থ দিয়া প্রস্তুত যে পরকলা আছে, তাহাকে আমরা চোখের ভিতরকার পেশীর সাহায্যে যেমন ইচ্ছা কুব্জ করিতে পারি। ইহাতেই চোখের পর্দ্দার উপরে কাছের এবং দূরের জিনিসের স্পষ্ট ছবি পড়ে। আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি?

তোমরা হয় ত দেখিয়াছ, বুড়ারা বই বা কাগজ তোমাদের মতো চোখের কাছে রাখিয়া পড়িতে পারেন না,—দেড় হাত বা দুই হাত তফাতে না রাখিলে তাঁহাদের অক্ষর চিনিয়া বই পড়া অসম্ভব হয়। কেন এমন হয়, তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে বুড়াদের চোখের পরকলা যেন কতকটা কঠিন হইয়া পড়ে এবং তা'ছাড়া চোখের পেশীগুলিও দুর্ব্বল হইয়া যায়। তাই তখন পরকলার মাঝখানটা স্বভাবতঃই নীচু হইয়া থাকে; তাহাকে ইচ্ছামত উঁচু করা যায় না। কাজেই, বুড়ারা কাছের জিনিসকে ঝাপ্‌সা দেখেন।

এখানে বুড়ার চোখের একটা ছবি দিলাম। দেখ, ছবিতে চোখের পরকলা ও তাহার পিছনের পর্দ্দা আঁকা আছে। পরকলার বেশি ঢালু হইয়া গিয়াছে, তাই বাহিরের জিনিসের আলো পর্দ্দায় পড়ে নাই,—অনেক পিছনে পড়িয়াছে। এই দোষ সংশোধনের জন্য তাঁহারা চোখে কুব্জপৃষ্ঠ পরকলার
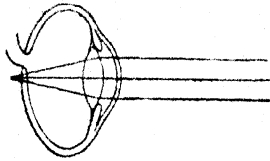
চশমা লাগাইয়া থাকেন। চশমার পরকলার সঙ্গে চোখের পরকলা মিলিয়া কাছের জিনিসের ছবিকে ঠিক্ পর্দ্দার উপরে ফেলে। তোমরা বোধ করি, বুড়াদের চশমার কাচে হাত দিয়া দেখ নাই। একবার পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে,
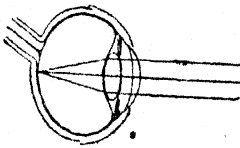
কুব্জপৃষ্ঠ পরকলা ছাড়া আর কিছুই নয়। বয়সের সঙ্গে চোখের পরকলা যত পাতলা হইয়া যায়, দোষ সংশোধনের জন্য ততই মোটা পরকলার চশমা ব্যবহার করিতে হয়। চোখে চশমা দেওয়ার পরে কি-রকমে বাহিরে আলো ঠিক্ পর্দ্দার উপরে পড়িয়াছে, তাহা পরের ছবিতে আঁকা আছে।

চোখের পরকলা দুর্ব্বল হইয়া গেলে দেখার কাজে যে কত অসুবিধা হয়, তাহার আর একটা উদাহরণ দিই। তোমরা বোধ করি জানো না, এক রকম চক্ষুরোগে চোখের স্বচ্ছ পরকলাখানি একবারে অনচ্ছ হইয়া যায়। কাজেই, তখন বাহিরের আলো

অনচ্ছ পরকলায় আটকায় বলিয়া চোখের পর্দ্দায় বাহিরের জিনিসের কোনো ছবি পড়ে না। এই রোগে মানুষ চোখ্ থাকিতেও অন্ধ হয়। ডাক্তারেরা ইহার চিকিৎসায় অস্ত্র দিয়া কৌশলে পরকলাখানিকে উঠাইয়া ফেলেন এবং স্বাভাবিক পরকলার বদলে কাচের পরকলার চশমা চোখে লাগাইয়া দেন। ইহাতে রোগী দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পায়, কিন্তু চশমা ব্যবহার না করিলে একটুও দেখিতে পায় না।

তোমাদের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ চশমা ব্যবহার করিয়া থাকো। চোখের কোন দোষ নিবারণের জন্য যুবক ও ছোটো ছেলেরা চশমা ব্যবহার করে, তাহা বোধ করি তোমরা সকলে জানো না। যখন চোখের পরকলার কুব্জতা খুব বেশি থাকে, তখন বাহিরের জিনিসের ছবি চোখের পর্দ্দায় না পড়িয়া তাহারি সম্মুখের কোনো জায়গায় পড়ে। কাজেই, এই অবস্থায় দূরের জিনিসকে অস্পষ্ট দেখায়। কিন্তু কাছের জিনিসকে দেখিতে অসুবিধা হয় না। এখানে চোখের একটা ছবি দিলাম। দেখ,
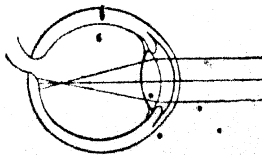
ইহাতে বাহিরের আলোর রশ্মি চোখের পর্দ্দায় না পড়িয়া তাহারি সম্মুখে একত্র হইয়াছে। ইহার পরের ছবিতেও তাহাই আঁকা রহিয়াছে। দেখ, চোখের সম্মুখে যে-রেখাটি আঁকা রহিয়াছে,

তাহার ছবি চোখের পিছনের পর্দ্দায় ভালো করিয়া পড়ে নাই। চোখের পরকালার কুব্জতা কমাইতে না পারিলে এই দোষের
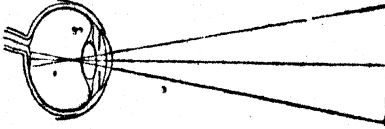
সংশোধন হয় না। তাই ন্যুব্জপৃষ্ঠ পরকলার চশমা ব্যবহার করিলে এই দোষ সংশোধিত হইয়া যায়। যাঁহারা দূরের জিনিস অস্পষ্ট দেখেন, তাঁহাদের চশমার পরকলা পরীক্ষা করিয়ো,
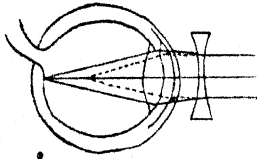
দেখিবে, তাহার মাঝখানটা পাশের চেয়ে নীচু। চোখের পরকলা বেশি কুব্জ হওয়ার যে-দোষ ঘটে, তাহা চশমার ন্যুব্জপৃষ্ঠ পরকলায় সংশোধিত হইয়া যায়। উপরের ছবিখানি দেখ। চোখে ন্যুব্জপৃষ্ঠ পরকলার চশমা ব্যবহারে কি-রকমে বাহিরের জিনিসের ছবি চোখের পর্দ্দায় পড়ে তাহা আঁকা রহিয়াছে।

চোখের পর্দ্দা ও বর্ণজ্ঞান

চোখের পিছনকার পর্দ্দার কথা তোমাদিগকে অনেকবার বলিয়াছি। ইহাকে মস্তিষ্কের স্নায়ুজালেরই অংশ বলা যাইতে পারে। মস্তিষ্ক হইতে অসংখ্য স্নায়ু দুইটা দড়ার মতো বাহিরে আসিয়া দুই চোখে দুইটি পর্দ্দার সৃষ্টি করিয়াছে। তাই পর্দ্দার উপরে বাহিরের ছবি পড়িলে তাহার অনুভূতি মস্তিকে পৌঁছায় এবং তাহাতে আমরা বাহিরের জিনিসকে দেখিতে পাই। কেবল ইহাই নয়, লাল, অরুণ, হলুদ প্রভৃতি রঙগুলিকেও চোখের পর্দ্দার গুণে চেনা যায়। সুতরাং ইহা সামান্য জিনিস নয়। যাহারা মরা মানুষের চোখ কাটিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, চোখের পর্দ্দায় অন্তত সাতটি স্তর দেখা যায়। কিন্তু মোটের উপরে পর্দ্দাটি খুব পাতলা কাগজের চেয়ে বেশি পুরু নয়। ভাবিয়া দেখ, যে-সকল স্তর দিয়া পর্দ্দা প্রস্তুত সেগুলি কত পাতলা। যাহা হউক, বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এই স্তরগুলির একটিতে কতকগুলি দণ্ড (Rods) ও মোচার (Cones) আকারের স্নায়ু সাজানো থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এই দণ্ড ও মোচাকার জিনিসগুলিই আমাদিগকে লাল নীল প্রভৃতি নানা রঙ্ দেখার সাহায্য করে। কি-রকমে সাহায্য করে, সে-সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানা কথা বলেন। জর্ম্মাণীর মহাপণ্ডিত হেলম্‌হোজ সাহেব রঙ্-দেখা

সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারি কথা প্রথমে আলোচনা করিব।

হেলম্‌হোজ্‌ বলেন, আমরা সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রে যে সাতটা রঙ্‌ দেখিতে পাই, সেগুলির সকলি মূল রঙ্‌ নয়। লাল, সবুজ ও বেগুনে এই তিনটিই মূল রঙ্‌ এবং এই তিনেরই নানাপ্রকার মিলনে অরুণ, হলুদ, আশ্‌মান, নীল প্রভৃতি বাকি রঙ্‌গুলির উৎপত্তি হয়। তিনি অরুণে ঘোর লাল ও ফিকে সবুজ, হলুদে ঘোর লাল ও ঘোর সবুজ এবং নীলে সবুজ ও বেগুনে ইত্যাদি জোড়া জোড়া মূল রঙ্‌ দেখিতে পাইয়াছিলেন। হেলম্‌হোজের এই আবিষ্কারের উপরে নির্ভর করিয়া আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন, আমাদের চোখের পর্দ্দায় যে দণ্ড ও মোচাকার জিনিস সাজানো থাকে, তাহাদের কতকগুলি লালে, কতকগুলি সবুজে এবং বাকি কতকগুলি বেগুনে রঙে সাড়া দেয়। অর্থাৎ যেগুলি লালে সাড়া দেয় তাহারা সবুজ বা বেগুনেতে সাড়া দেয় না; যেগুলি সবুজে সাড়া দেয়, তাহারা লালে বা বেগুনেতে সাড়া দেয় না, ইত্যাদি। কোনো রঙিন্‌ আলো চোখের পর্দ্দায় পড়িলে আমরা এই সাড়ার মাত্রা ভেদে রঙ্‌টিকে দেখিতে পাই।

হেরিং সাহেব একজন বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। কেবল রঙ্‌ লইয়াই তিনি অনেক বৎসর পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্তটি আবার আর এক রকমের। তিনি বলেন, আমাদের চোখের পর্দ্দায় তিন রকম দ্রব্যের প্রলেপ আছে। ইহাদের প্রত্যেকেরই গুণ পৃথক্‌। প্রথম বস্তু কেবল সাদা ও কালো রঙে

সাড়া দেয়। দ্বিতীয় বস্তু কেবল নীল ও সবুজে সাড়া দেয় এবং তৃতীয় বস্তু হল্‌দে ও নীল ভিন্ন অন্য রঙে সাড়া দিতে চায় না। কেবল ইহাই নয়, সাদা ও কালোতে যে-বস্তু সাড়া দেয়, তাহা অধিকক্ষণ সাদা আলো পাইলে ক্ষয় পায়, কিন্তু কালোতে পুষ্ট হয়। সেই রকম লাল ও সবুজে যাহা সাড়া দেয়, তাহা লালে ক্ষয় পায়, সবুজে পুষ্ট হয় এবং হলুদে ও নীলে যাহা সাড়া দেয় তাহা হলুদে ক্ষয় পায়, সবুজে পুষ্ট হয়। অর্থাৎ সাদা লাল ও হল্‌দে ক্ষয়কর রঙ্, এবং কালো সবুজ ও নীল পুষ্টিকর রঙ্। হেরিং সাহেব এই সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া বলেন, জলে স্থলে আকাশে নীল সবুজ ও কালো রঙের এত ছড়াছড়ি বলিয়াই আমাদের চোখ্ বিশ্রাম পাইয়া শক্তি সঞ্চয় করে। অন্ধকার রাত্রি, কালো জল, নীল আকাশ, সবুজ গাছপালা, সকলি আমাদের চোখের পরম উপকারী। পৃথিবীতে সাদা, হল্‌দে, লাল এই তিনটি ক্ষয়কর রঙের বাড়াবাড়ি থাকিলে আমাদের চোখগুলি বিশ্রামের অভাবে দুই দিনেই নষ্ট হইয়া যাইত।

রঙ্ চেনা সম্বন্ধে বড় বড় পণ্ডিতের মতামত তোমাদিগকে বলিলাম। কিন্তু এগুলি সত্য কিনা বলা কঠিন। বিষয়টি এমন জটিল যে, এ-সম্বন্ধে আসল কথা হয় ত চিরকালই অজানা থাকিবে।

তোমরা রাতকাণা লোক নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। কিন্তু রঙ্‌কাণা লোক দেখিয়াছ কি ? রাতকাণারা দিনের আলোতে সব জিনিসকেই স্পষ্ট দেখিতে পায়। কিন্তু রাত্রি হইলেই সর্ব্বনাশ ! তখন

আলো জ্বালিলেও কোনো জিনিস তাহাদের নজরে পড়ে না। রঙকাণারা দিনে ও রাত্রিতে সব জিনিসকেই দেখিতে পায়, কিন্তু কোনো সময়েই রঙ চিনিতে পারে না। তাই রঙ্কাণাদের বর্ণান্ধ (colour-blind) বলে। ইহাদের মধ্যে কেহ লাল রঙ্কে সাদা দেখে, কেহ বা সবুজকে সাদা দেখে। তা'ছাড়া লাল, অরুণ, হলুদ, নীল, বেগুণে প্রভৃতি রঙের যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে, তাহাও উহাদের নজরে পড়ে না। অদ্ভুত নয় কি? তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, এই রকম রঙ্কাণা লোক হাজারের মধ্যে হয় ত একটি আছে। কিন্তু তাহা নয়। এক শত লোকের মধ্যে অন্তত দশ-বারো জনকে প্রায়ই কোনো-না-কোনো রকমের রঙকাণা দেখা যায়। হয় ত তোমাদের মধ্যেই কেহ কেহ রঙ্কাণা আছে।

রাত্রিতে রেলওয়ে ষ্টেশনে কি-রকমে আলোর সঙ্কেতে দূরে খবরাখবর পাঠানো হয়, তাহা তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। লাল আলো দেখাইলে গাড়ী ষ্টেশনে আসে না। ড্রাইভার তখন বুঝিয়া লয়, রাস্তা বন্ধ; ষ্টেশনে গেলেই অন্য গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগিবে। তাই লাল আলো দেখিলে সে গাড়ী থামাইয়া দেয়। তা'র পরে যেই ষ্টেশন হইতে সবুজ আলো দেখানো হয়, অমনি গাড়ী ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়া চলে। পথ নিরাপদ, ইহাই সবুজ আলোর সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কেবল রেলগাড়ীতে নয়, জাহাজেও এই রকম সঙ্কেতে খবরাখবর দিবার রীতি আছে। তাহা হইলে দেখ, কোন্ আলো লাল এবং কোন্টাই বা সবুজ,

ইহা ড্রাইভার ও জাহাজের কাপ্তেনদের জানা থাকা খুবই দরকার। তাই এই সব কাজে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রার্থীরা রঙকাণা কিনা প্রথমেই পরীক্ষা করা হয়।

লোকে কেন রঙকাণা হয়, তাহা ঠিক্ বলা কঠিন। কেবল মনে রাখিয়ো, চোখের পিছনকার পর্দ্দার যে-সব স্নায়ুতে বিশেষ বিশেষ রঙ্ দেখা যায়, সেগুলি বিগ্ড়াইয়া গেলে লোকে রঙ্কাণা হয়। এ-সম্বন্ধে আজকালকার কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যাহা বলিতেছেন, তাহা বড় মজার। তাঁহারা বলেন, দশ হাজার বা বিশ হাজার বৎসর আগে যে-সব মানুষ পৃথিবীতে বাস করিত, তাহারা সকলেই রঙ্কাণা ছিল। অর্থাৎ তাহারা লাল, হল্‌দে, সবুজ, নীল প্রভৃতি রঙের তফাৎ ভালো ধরিতে পারিত না। তা'র পরে মানুষ যতই সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল ততই তাহাদের রঙ্ চিনিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। চারি-পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার আঁকা রঙিন্ ছবি, আজো অনেক দেশে আছে। তাহার বর্ণবিন্যাসের রীতির সহিত আজকালকার রীতির একটুও মিল দেখা যায় না। আধুনিক মানুষের চোখে সেই সব বর্ণযোজনা ছেলেখেলা বলিয়া বোধ হয়। অতি-প্রাচীনকালের লোকে যে, রঙ্ চিনিয়া ছবি আঁকিতে জানিত না, এই ব্যাপার হইতেও কতকটা প্রমাণ হয়।

মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীরা তাহাদের চোখ্ দিয়া কি দেখে এবং রঙ্গুলিকেও বা কি-রকম দেখে তাহা আন্দাজ করাও কঠিন। আমাদের মাথায় যেমন একজোড়া করিয়া চোখ্ থাকে, প্রজাপতি

প্রভৃতি পতঙ্গদের মাথায় দুই পাশে সেই রকম হাজার হাজার চোখ্ আছে। মাছির মাথায় চারি হাজার চোখ্ থাকে। প্রজাপতিদের চোখের সংখ্যা আরো বেশি। ইহাদের মাথার দুই পাশের প্রত্যেক চোখে সতেরো হাজার করিয়া ছোটো চোখ্ বসানো আছে। সব চেয়ে বেশি চোখ্ দেখা যায় গোবরে পোকাদের মাথায়, তাহাদের প্রত্যেক চোখের ভিতরে তেরো হাজার করিয়া ছোটো চোখ্ আছে। এই সব চোখে তাহারা কি দেখে আমাদের জানা নাই এবং জানিবারও বিশেষ সম্ভাবনা নাই। তবে গরু মহিষ প্রভৃতি প্রাণীরা যে, লাল রঙ দেখিয়া ভয় পায় তাহা আমরা জানি। কিন্তু সেই রঙ্কে তাহারা লাল দেখে বা অন্য কিছু দেখে তাহা জানিবার উপায় নাই। কয়েক বৎসর আগে একজন ডাক্তার মশার বর্ণজ্ঞান ঠিক করার জন্য একটি মজার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সতেরো রকম রঙের সতেরোটা বাক্স তৈয়ার করিয়া সেগুলির প্রত্যেকটিতে এক-একটি পাকা কলা রাখিয়া দিয়াছিলেন। তোমরা বোধ হয় জানো, মশারা পাকা ফল খাইতে ভালোবাসে। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আসিয়া বাক্সের কলায় বসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তা'র পরে কোন্ রঙের বাক্সে কতগুলি করিয়া মশা বসিল ডাক্তার আড়ালে থাকিয়া গুণিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। গোণা শেষ হইলে দেখা গেল, সব চেয়ে বেশি মশা বসিয়াছে লাল বাক্সে। তা'র পরে বাদামে কালো বেগুনে সবুজ ইত্যাদি বাক্সে মশার সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, খাকি রঙের বাক্সে একটি

মশাকেও বসিতে দেখা যায় নাই। এই পরীক্ষা হইতে বুঝা গিয়াছিল, মশা খুব ছোটো প্রাণী হইলেও তাহারা রঙ চিনিতে পারে এবং সব রঙের মধ্যে খাকি রঙ্‌কেই অপচ্ছন্দ করে। যেখানে মশার উৎপাত বেশি, সেখানে বোধ করি খাকি রঙের কাপড় জামা ও মশারি ব্যবহার করিলে মশার উপদ্রব নিবারণ করা যাইতে পারে।

আকৃতি ও দূরত্ব-বোধ

আমরা যে-সব জিনিসকে দিবারাত্রি চারিদিকে দেখিতে পাই, তাহাদের আকৃতি বোধ, একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। পটে বা বইয়ের পাতায় যে-গাছপালা মানুষ-গরু আঁকা থাকে, সেগুলিকে লেপা রকমের বোধ হয়। দেখিলেই মনে হয় যেন কাগজের বা কাপড়ের উপরে কতকগুলি রেখা টানা আছে। সেই সব রেখা দেখিয়া আমরা কোনো রকমে জিনিষগুলির আকৃতি আন্দাজ করিয়া লই। তুমি টেবিলের উপরের বই বাক্স দোয়াত কলম প্রভৃতিকে যেমন লম্বা চৌড়া ও উঁচু ঘন জিনিস বলিয়া বুঝিতেছ, পটে-আঁকা সাধারণ ছবিকে প্রায়ই সে-রকম ঘন দেখায় না। ঘন দেখাইবার জন্য চিত্রশিল্পীকে নানা রকম কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। কেমন করিয়া আমরা চারিদিকের জিনিসের ঘনতা বুঝিতে পারি, সে-সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে এখন সকলেই বলেন, আমরা যখন দুই চোখ্ দিয়া কোনো জিনিসকে দেখি, তখন ডাইন চোখে জিনিসটাকে যেমনটি দেখি, বাঁ চোখে ঠিক্ সে-রকমটি দেখি না। অর্থাৎ দুই চোখের দেখার মধ্যে বেশ একটু তফাৎ থাকে।

পরপৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। একটা কাঠের সমঘন (Cube) জিনিসকে ডাইন ও বাঁ চোখে পৃথক্ করিয়া দেখিলে কি-রকম

দেখায় তাহাই ছবির বামে ও ডাইনেতে দেখানো হইয়াছে। দেখ, ডান চোখে জিনিসটার সম্মুখের পিঠ সম্পূর্ণ এবং ডান পাশের খানিকটা দেখা যাইতেছে। কিন্তু বাঁ চোখে তাহা দেখা যাইতেছে না—ইহাতে জিনিষটার সম্মুখের পিঠ সম্পূর্ণ
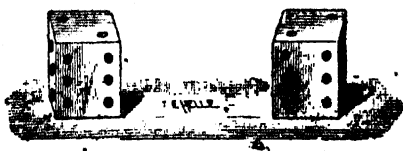
এবং বাঁ পিঠের খানিকটা নজরে পড়িতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, বাম ও ডাইন চোখের দেখার এই যে, একটু-আধটু তফাৎ, তাহাই প্রত্যেক জিনিসের যথার্থ আকৃতি আমাদের দেখাইয়া দেয়।

তোমরা ষ্টেরিয়োস্কোপের (Stereoscope) ছবি দেখিয়াছ কি? একটা কাঠের বাক্সে বা কাঠের ফ্রেমে দু'খানা কুব্জপৃষ্ঠ পরকলা লাগানো থাকে। এই দুইয়ের একখানিতে বাঁ চোখ অন্যখানিতে ডান চোখ লাগাইয়া ছবি দেখিতে হয়। ছবিগুলি বড় মজার। তোমরা আগে যে-ছবি দেখিলে তাহারি মতো কোনো জিনিসকে বাঁ চোখে এবং ডান চোখে একে একে দেখিলে যে-রকমটি দেখায়, ষ্টেরিয়োস্কোপের ছবিতে পাশাপাশি তাহাই আঁকা থাকে। তার' পরে সেই জোড়া-জোড়া ছবিকে

সেই পরকলা দু'খানির পিছনে রাখিয়া ডাইন ও বাঁ চোখে একসঙ্গে দেখিলে, ছবিদুইখানি পরস্পর মিলিয়া এক হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতেই ছবিতে আঁকা জিনিসের ঘনতা ও যথার্থ আকৃতি নজরে পড়ে। সুতরাং বাহিরের জিনিসকে দুই চোখে দেখার জন্যই যে, তাহাদের ঘনতা ও আকৃতি প্রকৃতি বুঝা যায়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। ষ্টেরিয়ো-স্কোপের ছবি পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় দিলাম। ইহার "প প" জায়গায় কাগজে-আঁকা এক জোড়া রাখিতে হয় এবং "চ চ" জায়গায় দুই চোখ্ রাখিয়া তাহা দেখিতে হয়। ইহাতে "ছ" জায়গায় সেই দু'খানি ছবি একত্র হইয়া ছবিতে আঁকা জিনিসের প্রকৃত আকৃতি দেখাইতে থাকে।
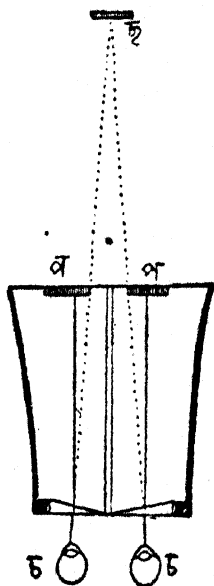
দুইটা জিনিসের মধ্যে কোন্‌টা কাছে এবং কোন্‌টাই বা দূরে আমরা চোখে দেখিয়া তাহা চট্ করিয়া বলিতে পারি। এই দূরত্ব বোধ কোথা হইতে আসে জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা অনেক পরীক্ষা ও চিন্তা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, জিনিসের আকৃতি বুঝিবার জন্য যেমন দুই চোখের ব্যবহার দরকার হয়, তেমনি দূরত্ব বুঝিবার জন্যও দুই চোখের প্রয়োজন দেখা যায়।

কোনো নূতন জায়গায় গিয়া তোমরা যদি এক চোখ্ বন্ধ করিয়া চারিদিকের ঘরবাড়ী গাছপালার দূরত্ব আন্দাজ করিতে যাও, তাহা তাহা হইলে দেখিবে, আন্দাজে অনেক ভুল হইতেছে, কিন্তু দুই চোখে দেখিলে সে-রকম ভুল হয় না।

বৈজ্ঞানিকেরা এসম্বন্ধে আরো যে-একটা কথা বলেন, তাহা বড় মজার। তাঁহারা বলেন, একটা জিনিস আর একটা জিনিস হইতে কত দূরে আছে, তাহা আমরা অভ্যাসের দ্বারা এবং হাতে ছুঁইয়া আন্দাজ করি। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। তোমাদের ছোটো খোকাটি আজো ভালো করিয়া হাঁটিতে শিখে নাই। তাহার বয়স হয় ত আট মাস। আকাশে চাঁদ দেখিলে বা দূরে উজ্জ্বল আলো দেখিলে সে বিছানায় শুইয়াই সেগুলিকে ধরিবার জন্য হাত বাড়ায়। কিন্তু চাঁদ ও আলো দূরে থাকে, কাজেই ধরিতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, আট মাসের শিশুর অভিজ্ঞতা নাই বলিয়াই সে দূরের জিনিসকে কাছে মনে করে। কিন্তু কিছু দিন হাঁটিয়া বেড়াইলে এবং নানা জিনিসকে হাত দিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলে সে ঐরকম ভুল করে না। ভুল করিলে তাহাকে পদে পদে বাধা পাইয়া আছাড় খাইতে হয় এবং ঘরের দেওয়ালে ও আসবাব-পত্রে ধাক্কা পাইয়া আঘাত পাইতে হয়। এই রকম ঠেকিয়া শিখিয়া যে-অভিজ্ঞতা জন্মে শিশু তাহা জীবনে ভুলে না। একটু দূরের জিনিসের দূরত্ব আন্দাজ করিবার সময়ে আমরা কি করি, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তখন কাছের ঘর-বাড়ী গাছপালা কত দূরে আছে, মনে ঠিক্ করিয়া তাহারি সঙ্গে

দূরের জিনিসের দূরত্বের তুলনা করি। ইহাতে দূরত্বের একটা আন্দাজ হইয়া যায়। যে-মাঠে বেশি গাছপালা বা ঘর-বাড়ী নাই, সেখানে দাঁড়াইয়া তোমরা যদি একটু দূরের জিনিসের দূরত্ব আন্দাজ করিতে যাও, তাহা হইলে মুস্কিলে পড়িবে,—আন্দাজে ভুল হইবে। এখানে কোনো জানা দূরত্বের সঙ্গে অজানা দূরত্বের তুলনা করার উপায় থাকে না বলিয়াই, ইহা ঘটে। যাঁহারা বন্দুক দিয়া পাখী শিকার করেন তাঁহারা বলেন, দূরে গাছের ডালে যে-পাখী বসিয়া আছে, তাহাকে গুলি করা সহজ। কিন্তু যে-পাখী আকাশে উড়িয়া চলিয়াছে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়া ভয়ানক কঠিন। কেন কঠিন, তাহা বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। আকাশে পাখী ছাড়া অন্য কোনো জিনিসকে দেখা যায় না। তাই অন্য জিনিসের দূরত্বের সঙ্গে পাখীর দূরত্ব তুলনা করার কোনো উপায় থাকে না। ইহাতে আন্দাজে ভুল হয়। কাজেই, ভুল আন্দাজ লইয়া গুলি ছুঁড়িলে তাহা পাখীর গায়ে লাগে না।

এই কথাগুলি বলিতে গিয়া আর একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ, উদয় ও অস্তের চন্দ্র-সূর্য্যকে প্রকাণ্ড বড় দেখায়। পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যার সময়ে যে-চাঁদ পূব আকাশে উদিত হয়, তাহা দেখ নাই কি? দেখিলেই মনে হয় যেন্ সে পাঁচটা চাঁদের মতো বড় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গভীর রাত্রিতে সেই চাঁদই যখন মাঝ আকাশে হাজির হয়, তখন তাহাকে নিতান্ত ছোটো দেখায়। কিন্তু যন্ত্র দিয়া মাপিলে

উদয়ের সময়কার চাঁদের যে-মাপ পাওয়া যায়, মাঝ আকাশের চাঁদের মাপ অবিকল তাহাই পাওয়া যায়। তবে উদয়াস্তের চন্দ্র-সূর্য্যকে বড় দেখায় কেন? তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, উদয় ও অস্তের সময়ে আলো গভীর বায়ুর স্তর ভেদ করিয়া আসে, তাহাতেই উহাদের বড় দেখায়। কিন্তু তাহা নয়। বিবর্ত্তনের ফলে উদয়াস্তের চন্দ্র-সূর্য্যকে উত্তরে ও দক্ষিণে একটু লম্বা দেখায় মাত্র। তবে বড় দেখাইবার কারণ কি?

বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সূর্য্য বা চাঁদকে যখন পূর্ব্বে বা পশ্চিম আকাশের নীচে দেখা যায়, তখন আমরা পৃথিবীর গাছপালা ঘর-বাড়ি প্রভৃতির সঙ্গে তাহাকে তুলনা করিতে পারি এবং তুলনায় তাহার একটি নির্দ্দিষ্ট আকৃতি কল্পনা করিয়া ফেলি। কিন্তু সেই চন্দ্র-সূর্য্যই যখন মাঝ আকাশে আসে, তখন অকূল আকাশে কোনো জিনিসের সঙ্গে তাহাদের তুলনা করা যায় না। ইহাতেই সে-সময়ে তাহাদিগকে ছোটো দেখায়।

চোখের দোষ

তোমরা চোখের অনেক গুণের কথা শুনিলে। এখন ইহার দুই একটি দোষের কথা বলিব। ব্যারাম হইলে চোখের দোষ হয়। তখন হয় ত আমরা ভালো করিয়া দেখিতে পাই না। আমরা এই রকম দোষের কথা বলিব না। যে-দোষগুলি স্বাভাবিক, অর্থাৎ সুস্থ অবস্থায় তোমার-আমার সকলের চোখেই দেখা যায়, কেবল সেই রকম কতকগুলি দোষের আলোচনা করিব।

কোনো কল চালাইতে থাকিলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কল-কব্জা ক্ষয় না পায়, বা ময়লামাটিতে বিগড়াইয়া না যায়, ততক্ষণ তাহা অবিরাম চলে। কাঠ, লোহা ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত কলের ক্লান্তি নাই। কিন্তু প্রাণীর শরীরে যে-সব যন্ত্র আছে, কিছু ক্ষণ চালিলেই সেগুলি ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তোমরা ইহা লক্ষ্য কর নাই কি? চলিয়া বেড়াইবার জন্য ভগবান আমাদের দু'খানি করিয়া পা দিয়াছেন। পায়ে হাঁটিয়া আমরা অনায়াসে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইতে পারি। কিন্তু একটুও বিশ্রাম না করিয়া যদি পাঁচ-ছয় ঘণ্টা অবিরাম হাঁটা যায়, তাহা হইলে কি হয় তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। তখন পা দুইখানি ক্লান্ত হইয়া পড়ে, আর হাঁটা যায় না। কিন্তু দুই-তিন ঘণ্টা বিশ্রাম করিলে পায়ের সেই ক্লান্তি আর থাকে না। তখন আরো দুই-

এক ক্রোশ অনায়াসে হাঁটা যায়। কেবল পায়েরই যে এই দোষ আছে তাহা নয়, পরিশ্রমে ক্লান্ত হওয়া দেহযন্ত্র মাত্রেরই একটা প্রধান দোষ। আমাদের চোখেরও সেই দোষটা আছে। কিন্তু ফোটোগ্রাফের ক্যামারাতে সে-দোষ দেখা যায় না। একটা ক্যামেরাতে এক সঙ্গে হাজার দু-হাজার ছবি উঠাও, তাহাকে একটুও ক্লান্ত দেখিতে পাইবে না। রাত্রিতে ক্যামেরার পরকলার ঢাক্‌নি খুলিয়া আকাশের দিকে ধরিয়া রাখো, দীর্ঘকাল আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকাতে তাহাকে একটুও ক্লান্তি দেখা যাইবে না। যে-সব অতি দূরের নক্ষত্রকে আমরা চোখে দেখিতে পাই না, এই রকমে তাহাদের ছবি ক্যামেরার ভিতরকার ফোটোগ্রাফের কাচে আপনিই আঁকিয়া যায়। কিন্তু আমাদের চোখ্ এক-দৃষ্টিতে কোনো জিনিসকে পাঁচ মিনিটও দেখিতে পারে না। এই সামান্য সময়ের মধ্যে হয় ত চোখ্ দুইটা শতবার পলক ফেলিয়া বিশ্রাম করে।

চোখের বেশি ক্লান্তি হয়, কোনো রঙিন জিনিসকে অধিকক্ষণ দেখিলে। তোমরা ইহা লক্ষ্য কর নাই কি? খুব টক্‌টকে লাল রঙে ছোপানো কাপড় বা বনাতের দিকে খানিক তাকাইয়া থাকিয়ো, দেখিবে, ইহাতে চোখ ক্লান্ত হইয়া টন্‌টন্ করিতেছে। কেবল ইহাই নয়। কিছুক্ষণ লাল জিনিসে তাকাইয়া তোমরা যদি কোনো সাদা জিনিসকে দেখিতে যাও, তবে তাহাকে সাদা দেখিবে না। তখন সেই সাদা জিনিসটাই হইয়া দাঁড়াইবে কতকটা যেন সবুজ। লাল রঙে আঁকা কয়েকটি অক্ষর লইয়া

পরীক্ষা করিলে, তোমরা বিষয়টা ভালো করিয়া বুঝিতে পারিবে। লাল হরফের দিকে এক মিনিট তাকাইয়া তোমরা সাদা দেওয়ালের দিকে তাকাইয়ো; দেখিবে, দেওয়ালের গায়ে আপনা হইতেই সেই রকম কতকগুলি সবুজ হরফ দেখা যাইতেছে। এই যে, এক রঙের বদলে আর এক রঙ্ দেখা, ইহা চোখের ক্লান্তিরই লক্ষণ। কেবল লাল রঙেই যে এরকম হয়, তাহা নয়। সবুজের দিকে তাকাইয়া সাদা জিনিসকে দেখিলে লাল, এবং নীলের দিকে তাকাইয়া সাদাকে দেখিলে হল্‌দে রঙ্ প্রকাশ হইয়া পড়ে। কেন এমন হয়, বোধ করি তোমরা তাহা জান না। একটা বিশেষ রঙ্‌কে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিলে আমাদের চোখ এমন ক্লান্ত হইয়া যায় যে, সাধারণ সাদা আলোতে তাহার সেই রঙ্ দেখার আর শক্তি থাকে না। কাজেই, তখন সেই বিশেষ রঙ্‌টি ছাড়া সাদা আলোর বাকি আর সব রঙ্ই চোখে পড়ে। অর্থাৎ তখন আমরা কেবল তাহার পরিপূরক রঙ্‌গুলিকেই দেখিতে থাকি। তাই লাল দেখিয়া চোখ ক্লান্ত হইলে সাদা আলোর ভিতরকার লাল ছাড়া অন্য রঙ অর্থাৎ সবুজ চোখে পড়ে; নীলের দিকে তাকাইলে নীল ছাড়া বাকি রঙ্ অর্থাৎ হল্‌দেকে দেখা যায়।

আর একটা উদাহরণের কথা বলি। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনো গোধূলির আলো আছে,—সম্পূর্ণ অন্ধকার হয় নাই। এমন সময়ে প্রদীপ জ্বালিলে ঘরের চেয়ার-টেবিল প্রভৃতির ছায়াগুলিকে কি-রকম দেখায় তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি? তখন

ছায়াগুলিকে যেন কতকটা নীল রঙের দেখায়। কেন দেখায় বলা কঠিন নয়। প্রদীপের হল্‌দে আলোতে তখন আমাদের চোখ্ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাই ঘরে যে সামান্য দিনের আলো থাকে, তাহার হল্‌দে আলোটা নজরে পড়ে না, নজরে পড়ে কেবল তাহারি পরিপূরক নীল আলো। কাজেই, ছায়াগুলিকে নীল দেখায়।

এখানে যে-ছবিটি দিলাম, তাহাতে তোমরা আমাদের চোখের আর একটা দোষের পরিচয় পাইবে। দেখ, ছবিতে

কতকগুলি সম-চতুর্ভুজ আঁকা আছে। সম-চতুর্ভুজগুলির মধ্যে কতকগুলি সাদা এবং কতকগুলি কালো। ঠিক্ মাঝের চতুর্ভুজ দুইটিকে দেখ। উপরকার সাদা চতুর্ভুজটিকে স্পষ্টই নীচেকার কালো চতুর্ভুজের চেয়ে বড় দেখাইতেছে। কিন্তু সত্যই সে-দুইটি ছোটো-বড় করিয়া আঁকা নাই। মাপিয়া দেখিলে দুইটিকেই অবিকল একই দেখাইবে। কিন্তু চোখে সাদাটিকেই বড় দেখাইতেছে। উজ্জ্বল জিনিসকে বড় করিয়া দেখা চোখের একটা বিশেষ দোষ। তোমরা শুক্লপক্ষের চতুর্থী বা পঞ্চমীর খণ্ড চাঁদকে ভালো করিয়া লক্ষ্য করিয়াছ কি? যদি লক্ষ্য কর, তবে দেখিবে, চাঁদের উজ্জ্বল কলাকে স্পষ্টই তাহার নীচেকার অনুজ্জ্বল অংশ অপেক্ষা বড় দেখাইতেছে। উজ্জ্বল জিনিসকে আকারে বড় দেখায় বলিয়াই ইহা ঘটে।

নীচের ছবি দুইখানি লক্ষ্য কর। দেখ, দুইটি সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রের একটির উপর-নীচে এবং অপরটির পাশাপাশি কতকগুলি রেখা টানা হইয়াছে। ক্ষেত্র দুইটি অবিকল একই মাপে
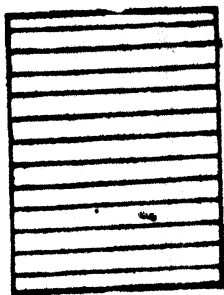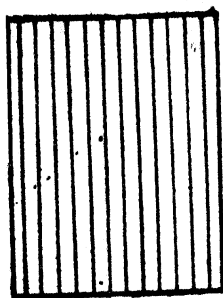
আঁকা আছে। কিন্তু চোখে তাহা বুঝা যাইতেছে না। যে-ক্ষেত্রটিতে রেখাগুলি উপর-নীচে টানা আছে, সেইটিকেই চওড়ায় বেশি দেখাইতেছে এবং অপরটিকে লম্বায় বড় বোধ হইতেছে। পরপৃষ্ঠার প্রথম চিত্রটিকে ভালো করিয়া দেখ। ছবিতে কয়েকটি সমান্তরাল রেখা আঁকা আছে। তা'র পরে সেই সমান্তরাল রেখাগুলিকে কতকগুলি বাঁকা-বাঁকা রেখা দিয়া ছেদ করা হইয়াছে। দেখ, ইহাতে সমান্তরাল রেখাগুলিকে মোটেই সমান্তরাল বোধ হইতেছে না। মনে হইতেছে, যেন রেখাগুলি বাঁকা। দ্বিতীয় ছবিখানি আরো মজার। দ্বিতীয় চিত্রের "কখ" ও "গঘ" রেখা দুইটি অবিকল সমান। রেখাগুলির প্রান্তে দুই রকম শর-চিহ্ন আঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে "কখ"কে

"গঘ"এর চেয়ে স্পষ্ট ছোটো দেখাইতেছে। আশ্চর্য্য নয় কি? আমাদের চোখের দোষেই এই সকল দৃষ্টিবিভ্রম হয়।

আমাদের চোখের আর একটা প্রধান দোষ এই যে, তাহার
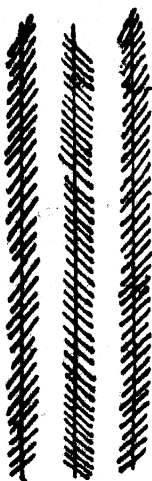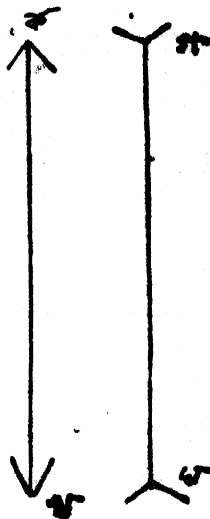
১ম চিত্র ২য় চিত্র

কাজগুলো বড় ধীরে চলে। তোমরা বোধ করি মনে কর, চোখে আলো পড়িবামাত্র আমরা সেই আলো'কে দেখিতে পাই। কিন্তু তাহা নয়। কোনো জিনিসের আলো চোখে পড়ার অনেক পরে তাহা আমাদের নজরে পড়ে। আবার আলো নিবিয়া যাইবার অনেক পর পর্য্যন্ত সেই আলো'কে দেখা যায়। তোমরা বোধ হয় কথাটা বুঝিলে না। একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। একটা

কাঠির আগায় আগুন ধরাইয়া চোখের সম্মুখে ঘুরাইতে থাকো। এই অবস্থায় আগুনকে কি-রকম দেখায়, তোমরা লক্ষ্য কর নাই কি? তখন কাঠির আগার আগুনকে বোধ হয় যেন একটা আগুনের ফিতা। আমরা ছেলেবেলায় ঝাঁটার কাঠির আগায় আগুন ধরাইয়া এই রকমে অনেক খেলা করিয়াছি। তোমরাও বোধ হয়, করিয়াছ। আগুন থাকে কাঠির আগায় এক জায়গায়, কাঠিকে ঘুরাইলে সেই আগুনকেই একেবারে অবিচ্ছিন্ন ফিতার আকারে দেখায় কেন? ইহার উত্তরে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, কাঠি ঘুরাইবার সময়ে তাহার আগার আগুন যেমন এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় সরিয়া যায়, চোখের দোষে আমরা তাহার আলো'কে অনেকক্ষণ ধরিয়া সরিয়া যাইতে দেখি না। কাজেই, কাঠির আগুন এক দিক্ হইতে অন্য দিকে চলিয়া গেলেও, তাহা আগে যে-আলো দিয়াছে সেই আলো'কে আমরা দেখিতে থাকি। ইহাতে একটা অবিচ্ছিন্ন আলো ফিতার মতো চোখে পড়ে। চোখের সম্মুখ দিয়া যখন ঘোড়া বা কুকুর জোরে ছুটিয়া চলে, তখন সে কোন্ পা'খানিকে কি-রকমে তুলিয়া কখন মাটিতে ফেলিল আমরা তাহা চোখে দেখিতে পাই না। গাড়ীর চাকা যখন তাড়াতাড়ি ঘুড়িতে থাকে, তখনো তাহা কি-রকমে ঘুরিতেছে নজরে পড়ে না। এই সব ভুলও চোখের ঐ দোষে ঘটে।

তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, চোখের এই দোষ না থাকিলেই বুঝি ভালো হইত। কিন্তু তাহা নয়। আলো বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার রেশ চোখ হইতে চলিয়া গেলে আমরা

অনেক বিষয়ে মুস্কিলে পড়িতাম। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। চোখের পলক ফেলা আমাদের একটা বিশেষ অভ্যাস। পলকে পলকে চোখ না বুজিলে আমাদের অস্বস্তি হয়। পড়িতে পড়িতে, লিখিতে লিখিতে, বেড়াইতে-বেড়াইতে আমরা চোখের পাতা দুইটিকে বুজাইয়া পলক ফেলি। অথচ ক্ষণে-ক্ষণে চোখ্ বোজার জন্য আমাদের দেখার কোনো অসুবিধা হয় না। কেন হয় না, তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। আগে যে-সব জিনিস আমরা দেখিতেছিলাম, পলক ফেলিয়া চোখ্ বোজার সময়ে তাহার রেশ আমাদের চোখে থাকিয়া যায়। ইহাতেই আমরা পলকে-পলকে অন্ধকার না দেখিয়া আগে যে-জিনিস দেখিতেছিলাম, তাহাই অবিচ্ছেদে দেখিতে থাকি। প্রত্যেক পলকে যদি চোখে অন্ধকার দেখা দিত, তাহা হইলে কি মুস্কিলই হইত। তখন কোনো জিনিসকে অবিচ্ছেদে দেখাই কঠিন হইত। আর একটা উদাহরণ দিই। ছোটো ছেলেরা অক্ষর পরিচয়ের পরে যখন বই পড়া সুরু করে, তখন কথার সমস্ত অক্ষরকে এক সঙ্গে দেখিয়া তাহার উচ্চারণ কি হইবে বুঝিয়া লয়। বই পড়ার সময়ে বোধ করি আমরাও ঐরকমে বইয়ের কথা বুঝিয়া লই। কিন্তু এক অক্ষর হইতে অন্য অক্ষরে চোখ্ দিবা মাত্র যদি আগেকার অক্ষরের রেশ চোখ হইতে মুছিয়া যাইত, তাহা হইলে বই পড়া সম্ভব হইত কি? কখনই হইত না। তখন আমরা বইয়ের পাতার অক্ষরগুলিকে একে একে ছাড়া-ছাড়া দেখিতাম। কাজেই, কোন্ কোন্ অক্ষর এক সঙ্গে মিলিয়া কোন্ কথা প্রকাশ করিল,

তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইত না। দেয়ালির সময়ে যখন হাউই বাজী পোড়ানো হয় তখন মনে হয় যেন একটা আলোর রেখা মাটি হইতে আকাশের উপরে উঠিতেছে। কিন্তু এই রেখার আগাগোড়া সত্যই উজ্জ্বল থাকে না। হাউইয়ের মুখের আগুনই জোরে আকাশের উপরে উঠে। তাহারি আলোর রেশ অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাদের চোখে থাকে বলিয়াই হাউইয়ের আগুনকে আমরা রেখাকারে দেখিতে পাই।

বায়োস্কোপ

তোমাদের মধ্যে হয় ত অনেকেই বায়োস্কোপের ছবি দেখিয়াছ। কি সুন্দর ছবি! ঘোড়া দৌড়িতেছে, রেলগাড়ি আসিতেছে, পাখী উড়িতেছে, রাস্তায় মানুষ ও মোটর গাড়ি চলিতেছে, ইহাতে এগুলিকে সুস্পষ্ট দেখা যায়। আমরা ছেলেবেলায় যখন প্রথমে বায়স্কোপের ছবি দেখিয়াছিলাম, তখন ভাবিতাম একি কাণ্ড! কেমন করিয়া চলন্ত ছবি দেখা যায়। এখন তোমরা ব্যাপারটা বুঝিতে পারিবে।

তোমরা আগেই শুনিয়াছ, আমাদের চোখের এমন একটি দোষ আছে যে, কোনো আলোকে বা কোনো জিনিসকে খুব অল্পক্ষণের জন্য একবার দেখিলে তাহার রেশ চোখ্ হইতে শীঘ্র যাইতে চাহে না। বৈজ্ঞানিকেরা চোখের এই দোষটারই ব্যবহার করিয়া বায়স্কোপ উদ্ভাবন করিয়াছেন। ম্যাজিক্ লণ্ঠনে কি-রকমে ছবি দেখানো হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো। এই যন্ত্রের সম্মুখে একখানা কুব্জপৃষ্ঠ পরকলা লাগানো থাকে এবং তাহারি পিছনকার আলোতে একটা ছবি রাখা হয়। কাজেই, ইহার একটা প্রতিবিম্ব বড় হইয়া দেওয়ালের গায়ে বা কাপড়ের পর্দ্দার উপরে পড়ে। ইহাই ম্যাজিক্ লণ্ঠনের ছবি। বায়োস্কোপের ছবিও প্রায় সেই রকম। এই যন্ত্রের সম্মুখেও কুব্জপৃষ্ঠ পরকলা থাকে এবং পিছনে খুব উজ্জ্বল আলো রাখা

হয়। এই আলোতে কোনো ছবি ধরিলে তাহার প্রতিবিম্ব বড় হইয়া সম্মুখের পর্দ্দার উপরে পড়ে। কিন্তু বায়োস্কোপের ছবি ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির মতো নয়। এই ছবি কি-রকমে তৈয়ারি করা হয় জানিতে পারিলে, ইহার চলন্ত প্রতিবিম্ব কেন দেখা যায়, তোমরা বুঝিতে পারিবে।

তোমরা ফোটোগ্রাফের ছবি-তোলা দেখিয়াছ কি? ক্যামেরার পরকলাখানিকে এক নিমেষের জন্য খুলিলেই সম্মুখের সব জিনিসের ছবি ক্যামেরার পিছনকার ফোটোগ্রাফিক কাচে আঁকিয়া যায়। তাই আজকাল ক্যামেরার পরকলাকে কলের সাহায্যে প্রতি মিনিটে এক-হাজার দেড়-হাজার বার খুলিয়া ও বুজাইয়া মিনিটে এক-হাজার দেড়-হাজার ছবি তোলা হইতেছে। মনে কর, তুমি যেন একটা ক্যামেরা লইয়া দাঁড়াইয়া আছ এবং তোমার সম্মুখ দিয়া যেন একটা লোক খুব দৌড়াইয়া চলিতেছে। এখন যদি তুমি ক্যামেরার পরকলাখানিকে হাজার বার খুলিয়া হাজার বার বন্ধ কর, তবে কি হইবে বলা যায় না কি? তখন যে-লোকটা দৌড়াইতেছিল, তাহার দৌড়ানো অবস্থার হাজার রকমের হাজার খানি ফটোগ্রাফ ছবি ক্যামেরাতে আঁকা হইয়া যাইবে। কোনো ছবিতে দৌড়াইবার সময়ে লোকটা যে-রকমে ডাইন পা উঠাইয়াছিল আঁকা থাকিবে, কোনো ছবিতে লোকটা সেই পা ফেলিয়া কি-রকমে বাঁ পা উঠাইয়াছিল, তাহা দেখা যাইবে। এই রকমে লোকটা দৌড়াইবার সময়ে এক মিনিটের ক্ষণে ক্ষণে যত রকম ভঙ্গি করিয়াছিল, তাহা ধারাবাহিক আঁকা হইয়া যাইবে।

এখানে যে-ছবিগুলি দিলাম, তাহার প্রথম খানি দেখ। একটা লোক যখন দৌড়াইতেছিল, তখন ক্যামেরা দিয়া প্রতি মিনিটে তাহার পাঁচশতখানা ফোটোগ্রাফ্ তোলায় এইরকম ছবি পাওয়া গিয়াছিল। দেখ, ছবি একই লোকের হইলেও তাহার কোনো ছবি, অন্য ছবির ঠিক্ সমান নয়। দৌড়াইবার সময়ে লোকটা যেমন করিয়া পা ফেলিয়াছিল, যে-রকমে ঘাড় বাঁকাইয়াছিল, ছবিখানিতে তাহাই ধারাবাহিক সাজানো আছে। ইহার পরে যে দুইখানি ছবি দিয়াছি, এখন সেগুলি লক্ষ্য কর একটা পাখী উড়িয়া আসিয়া মাটিতে বসিতেছিল। তাহার সেই অবস্থায় খুব তাড়াতাড়ি অনেকগুলি ছবি তোলায় এই ছবি দুইখানি পাওয়া গিয়াছিল। উড়িবার সময়ে সে কি-রকমে ডানা খুলিয়াছিল, কি-রকমে ডানা নাড়িয়াছিল এবং তা'র পরে কি-রকমে ডানা গুটাইয়া সে মাটিতে নামিয়াছিল, সব অবস্থারই ভঙ্গি হুবহু ছবিতে আঁকা আছে। বায়স্কোপে চলন্ত ছায়াবাজি দেখাইবার সময়ে এই-রকম ছবিই ব্যবহার করা হয়।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এই ছবিগুলিকে চলন্ত দেখাইবে কি করিয়া। কি করিয়া চলন্ত দেখায়, এখন সেই কথাটাই তোমাদিগকে বলিব। মনে কর, একটা ঘোড়া, মানুষ বা কুকুরের ছবিতে কাঁচি দিয়া কাটিয়া তাহার মাথা ও ধড়টাকে আলাদা রাখা গিয়াছে। এখন এই ছবিকে আলাদা করিয়া দেখিলে একটাতে কেবল মাথা এবং অন্যটাতে কেবল ধড় ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু দু'টাকে জুড়িয়া দেখিলে

একটি সম্পূর্ণ প্রাণীর ছবি নজরে পড়ে। বায়োস্কোপের ছবিতে যেন সেই রকমেরই ব্যাপার ঘটে। আর একবার পূর্ব্বের সেই প্রথম ছবিখানি দেখ। এই ছবিতে দৌড়াইবার সময়ে একটা লোক পর পর যে-রকম ভঙ্গি করিয়াছিল, তাহা ধারাবাহিক আঁকা আছে। এখন যদি ছবিখানিকে তাড়াতাড়ি চোখের সম্মুখ দিয়া টানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে কি হয় বলা যায় না কি ? তখন ইহার এক অংশের ছবিগুলাকে দেখার রেশ চোখ্ হইতে মিলাইতে না মিলাইতে অন্য অংশের ছবি চোখে আসিয়া পড়ে। ইহাতে একটা ছবি যেন অন্যগুলার সঙ্গে জুড়িয়া যায়। কাজেই, লোকটা যে-রকমে পা তুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া ছুটিয়াছিল, তাহাই আমরা হুবহু দেখিতে পাই। ইহাই বায়স্কোপের চলন্ত ছায়া-বাজি।

বায়োস্কোপে দেখাইবার জন্য চলতি রেলগাড়ি বা মোটর গাড়ি প্রভৃতির হাজার হাজার অবস্থার হাজার হাজার ছবি একটা লম্বা ফিতার মতো কাগজে আঁকা থাকে। তা'র পরে বায়োস্কোপের কলের ভিতরে রাখিয়া সেই ছবিগুলার প্রতিবিম্ব পর্দ্দার উপরে ফেলা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবির ফিতাটাকে খুব তাড়াতাড়ি টানা হয়। কাজেই, প্রতিবিম্বের একটার রেশ আর একটার সঙ্গে মিলিয়া গেলে রেলগাড়ি ও মোটর গাড়ি সত্যই চলাফেরা করিতেছে বলিয়া মনে হয়। এখানে বায়োস্কোপের যে-ছবি দিলাম তাহা দেখিলে যন্ত্রটি যে কি রকম তোমরা তাহা আন্দাজ করিতে পারিবে।

তাহা হইলে বলিতে হয়, বায়োস্কোপের ছায়াবাজি এক
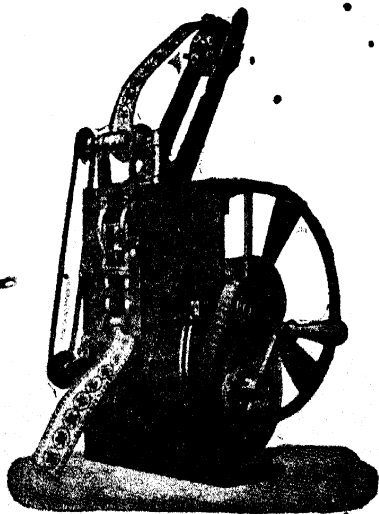
রকম ধাঁধাঁ ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমাদের চোখের যে-একটু দোষ আছে, তাহা লইয়াই এই ধাঁধাঁ দেখানো হয়।

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ :—

১। বৈজ্ঞানিকী (২য় সংস্করণ)
২। প্রাকৃতিকী (২য় সংস্করণ)
৩। গ্রহ-নক্ষত্র (৩য় সংস্করণ)
৪। বিজ্ঞানের গল্প (২য় সংস্করণ)
৫। পোকামাকড় (২য় সংস্করণ)
৬। প্রকৃতি-পরিচয় (২য় সংস্করণ)
৭। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার (২য় সংস্করণ)
৮। গাছ-পালা
৯। মাছ ব্যাঙ সাপ
১০। বাংলার পাখী
১১। পাখী
১২। শব্দ
১৩। স্থির বিদ্যুৎ
১৪। চল বিদ্যুৎ
১৫। আলো
১৬। চুম্বক

প্রাপ্তিস্থান—

ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্

২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

কলিকাতা